প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা। মার্চ - এপ্রিল ২০১৯। ২০ টাকা

ভয়েস মার্ক

লোকসভা নির্বাচন ২০১৯ ● তথ্য-লোপাট তথ্য-বিকৃতি ● বেকারত্ব ● মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ● অক্সফাম প্রতিবেদন ● শ্রেণি রাজনীতি ● রক্ষণাত্মক মানস ● ধর্ম ● মূল্য বিশেষিত মানবসত্তা ● মুসলিমদের পিছিয়ে পড়ার কারণ ● অতি সবুজ বিপ্লব ● গল্প ● কবিতা

ভয়েস মার্ক

দ্বি-মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক

মো. ফিরোজ হোসেন

পত্রিকা সম্পর্কিত

দ্বি-মাসিক পত্রিকা

প্রতি সংখ্যার মূল্য ২০ টাকা

গ্রাহক চাঁদা সডাক ১০০ টাকা। যে কোনো সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

গ্রাহক পরিষেবায় যোগাযোগ : রনিক পারভেজ, ৯৩৭৮৪৮০১৯২

পত্রিকার যোগাযোগ স্থান

বহরমপুর : মো. আযাদ হোসেন, ৯৯৩২৮৩৭১৮৫

বর্ধমান : মো. আল আমিন, ৮১১৬২৭৯১৫২

বাঁকুড়া : রনিক পারভেজ, ৯৩৭৮৪৮০১৯২

দ: ২৪ পরগণা : মো. আরিফ হোসেন, ৮৯২৬৭৪৪১৪০

উত্তরবঙ্গ : মো. ফিরোজ হোসেন, ৯৪৩৪৬৫৫৬১০

যোগাযোগ

পিরতলা, উপর ফতেপুর,

লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১৪৮.

E-mail: voicemark19@gmail.com

Mob: 9434655610

ভয়েস মার্ক

প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা। মার্চ-এপ্রিল ২০১৯

সম্পাদক
মহ. ফিরোজ হোসেন
ferozhossain77@gmail.com.
WhatsApp : 9434655610

গ্রাহক পরিষেবা: রনিক পারভেজ, ৯৩৭৮৪৮০১৯২

নামলিপি ও প্রচ্ছদ চিত্র : হিমাদ্রী শেখর মজুমদার

মূল্য : কুড়ি টাকা

মো. ফিরোজ হোসেন কর্তৃক পিরতলা, উপর ফতেপুর, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১৪৮ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক কিস অফসেট প্রেস, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ৭৪২১০১ থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়
লোকসভা নির্বাচন ২০১৯ ৫

সাম্প্রতিক ইশ্যু
বেকার সমস্যাঃ এসএসসি কর্মপ্রার্থীদের অনশন ৭

শিক্ষায় মূল্যায়ন ব্যবস্থাপনা ৯

প্রবন্ধ
জাকাত প্রযুক্তিঃ ইতিহাসের অতীত ও বর্তমান
আযাদ রহমান ১৫
সবুজ বিপ্লব থেকে অতি সবুজ বিপ্লব
অনুপম পাল
আর্থসমাজ জীবনে মুসলিমদের পিছিয়ে পড়ার কারণ
‘অস্তিত্ব’: বিশ্লেষণ ও সম্পাদনা - ইমদাদুল হক ১৭
রক্ষণাত্মক মানস ও বিকাশশীল মনন’
কিংশুক ২৮
মানুষের ধর্ম
উজান ৩১
মূল্য বিশেষিত মানব সত্তা
প্রভাস ৩৫
গল্প
বেস্ট কাপল
তানিয়া খাতুন ৪৮
ভোর
সুকৃতি
তাসের ঘর
বৈশালী রায়চৌধুরী ৫১
দ্বন্দ্ব
আল আমিন
কাজী নামা
আসফাক আলম
কবিতা
কবি ও কবিতা
অশনিকা ঋদ্ধি

সম্পাদকীয়

লোকসভা নির্বাচন ২০১৯

নির্বাচনে আর্থসামাজিক সম্পদের অর্থাৎ উদবৃত্ত মূল্যের বা অন্য ভাষায় শ্রম-উৎপাদন-মূল্য-আবশ্যিক-উদবৃত্ত এর বিন্যাস ব্যবস্থাপনার প্রতিনিধিত্ব ক্ষমতা নির্বাচন করা হয়। আর্থসামাজিক সম্পদের কোন অংশ কোন খাতে কিভাবে বিন্যস্ত হলে কিভাবে কত শ্রমক্ষেত্র তৈরি হবে, পরিকাঠামো কেমন হবে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগসহ যাবতীয় ক্ষেত্রে উদবৃত্তের বিনিয়োগ ও রিটার্ন কী আসবে সেই ক্ষমতা নেতৃত্ব তার ব্যবস্থাপনা করেন। যার মাধ্যমে আর্থসামাজিক শান্তি অর্থাৎ জীবনভোগ সুস্থ, সুন্দর ও সুসমঞ্জস হয়।

স্বাধীনতার পর একের পর এক নির্বাচন হয়ে এসেছে। নির্বাচনের যে মৌলিক লক্ষ্য আর্থসামাজিক শান্তি ভোগ তা কি ধরা ছোঁয়ায় পাওয়া যাচ্ছে? গেছে? স্বাধীনোত্তর ভারতে রক্ষণকামের গাঁট ছড়ায় মিশ্র অর্থনীতির শ্লোগানের পরিণাম দেশ দেখেছে। কৃষি ও ভারীশিল্পের বিকাশের লক্ষ্য সামনে রেখে একের পর এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হয়েছে। নেহেরূ জামানার শেষে ইন্দিরা জামানায় পুঁজির হোম মার্কেট ওপেন করতে কৃষিতে সবুজ বিপ্লবের আমদানি করা হয়েছে। দেশ খাদ্যে স্বনির্ভর হয়েছে। পিএল ৪৮০ এর মত আমেরিকান আইনে গম সহ কোনো খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয় না দেশকে। কিন্তু কৃষি সংকট কি ঠেকানো গেছে? কৃষক আত্মহত্যা কি কমেছে? গরীরী হঠাও এর গরীব কি কমেছে? বেকারত্ব আর সামাজিক ডিসক্রিমিনেশন কি শেষ হয়েছে? হয় নি।

মিশ্র অর্থনীতির জল বেয়ে দেশ ৯০ এ বিশ্বায়িত হয়েছে। পাবলিক সেক্টর বলে পরিচিত সংগঠনগুলি বিক্রি হয়ে গেছে। শিল্পে নতুনভাবে সরকারি বিনিয়োগ নেই। ৬০ এর দশকের মাঝামাঝি থেকে ৮০ দশক পর্যন্ত কৃষিতে পুঁজির দাপাদাপি কৃষিকে শেষ করেছে। ক্রমশ একবিংশের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছি। নির্বাচনে জনতা বার বার মন্দ ও মন্দের ভাল বাছাই করেই চলেছে।

এই সমস্ত ধাপেই কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকার শুরু হয়েছে। ইউপিএ ১ ও ইউপিএ ২ ভারতীয় জনতা ১০ বছর এদের ক্ষমতায় বসিয়েছে। মুক্তবাজারি অর্থনীতি আরও জাঁকিয়ে বসেছে। ক্রমশ আর্থসামাজিক সম্পদ পুঁজি গোষ্ঠী থেকে এমএনসিতে হাত ফেরত হয়েছে। সম্পদ কুক্ষি প্রবণতা ভয়ানক আকার নিয়েছে। জনতাকে কর্মক্ষেত্র দিতে না পেরে NREGA এর মত ডোল পলিটিক্স চালু হয়েছে। ইউপিএ ২ এর প্রোকর্পোরেট নীতি না জননীতি এই প্রশ্নে শাসকের ন যযৌ ন তস্থৌ অর্থাৎ নীতি পঙ্গুত্ব কর্পোরেট গোষ্ঠীগুলিকে বিজেপি মুখীন করল। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল মুক্তবাজার অর্থনীতির পলিসিতে দেশি রংচমক লাগানো বিকাশের ধারণাকে জোর করে প্রচার করতে। গুজরাট মডেল সামনে এল। সবকা সাথ সবকা বিকাশ তত্ত্ব আমদানি হল। স্লোগানের পর স্লোগান। বছরে দুকোটি কর্মসংস্থান ইত্যাদি। নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদির গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন কলংজনক ইমেজ সত্ত্বেও তাকে বিকাশ পুরুষ হিসেবে তুলে ধরা হল কর্পোরেট লবি ও তার গাঁটছড়া সঙ্গী মিডিয়ার সাহায্য। বিদ্যমান নিবার্চনী ব্যবস্থায় ৩১ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজেপি ২০১৪ সালে একক সংখ্যা গরিষ্ট হল। সরকার

নির্বাচনী মেনিফেস্টোর প্রতিশ্রুতিগুলির কোনো একটিকেও ইমপ্লিমেন্ট করতে পারল না। গুজরাট মডেল, বিকাশ এসব কথা তাদের বক্তব্য থেকে উবে গেল ক্রমশ। কালোটাকা উদ্ধারের স্বপ্ন দেখিয়ে ডি-মানিটাইজেশনের মতো অপরিণামদর্শী সিধান্তে দেশের জনতাকে অশেষ অশান্তির দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়ে দিল। অর্থনীতি গত তিন-চার বছরে সেই অবস্থা আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

এনডিএ সরকার যত মেয়াদের শেষের দিকে আসতে থাকল বিকাশ মডেল বা অর্থনীতিক উন্নয়নের স্লোগানের বদলে হিন্দুত্ব, প্রতিরক্ষা, দেশপ্রেম স্লোগানগুলি মুখ্য হয়ে উঠতে থাকল।

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন ২০১৯। শাসক দলের মেনিফেস্টো প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে বিকাশ নেই। আছে শক্ত শাসন। দেশের নিরপত্তার কথা।

বিরোধী প্রধান দলটির ইস্তেহার তার আগেই প্রকাশিত হয়েছে। তাতে কর্মসংস্থান, নয়া ডোল স্কিম, নারীর অধিকার, কৃষকসমস্যা প্রকৃতি ইস্যুগুলি স্থান পেয়েছে। প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবায়নের অর্থসংস্থান কিভাবে হবে তা নিয়ে স্পষ্ট দিশা নেই।

নির্বাচন হচ্ছে এনডিএ জোট, ইউপিএ জোট ও আঞ্চলিক দলগুলির রাজনৈতিক জোটের সমীকরণে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন বিজেপির জেতা শক্ত হলেও অসম্ভব নয়। বিরোধীরা যেহেতু সামগ্রিক জোট করতে ব্যর্থ হয়েছে।

দেশে ৪৫বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বেকারত্ব, কৃষি সংঙ্কট, শ্রমিক ও দরিদ্রতর অংশের মানুষ এস্টাবলিসমেন্টের বিরুদ্ধে যাবে বলে অনেক বিশ্লেষক মনে করছেন। এই কারণে শাসক দলের রাজনৈতিক বিভেদ পন্থার আশ্রয় প্রকট হয়ে উঠছে।

অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমক্রেটিক রিফর্মস নামক ভারতীয় গণতন্ত্রের একটি সমীক্ষক সংস্থার হিসেব মতো গত লোকসভা নির্বাচনে বিজয়ী ৮৩ শতাংশ সাংসদ কোটিপতি। যার মধ্যে ৫২শতাংশ সাংসদ শাসক দলের। ৩৩শতাংশ সাংসদ অপরাধমূলক আইনে অভিযুক্ত। নির্বাচন কমিশনে জমা দেয়া স্বঘোষণাপত্র বিশ্লেষণে এই তথ্য মিলেছে। নির্বাচনকে বস্তু সম্মত করতে ইলেকট্রাল রিফর্মস কিভাবে কোন রাস্তায় করলে সীমাহীন ব্যক্তিমালিকাধীন সম্পত্তি ও অপরাধ আইনে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছবে না— বিষয়টি কোনো রাজনৈতিক দলের ইস্তেহারে স্থান পায়নি।

২০১৯ এর নির্বাচন শুরু মানে আরেকটি নির্বাচনের দিন গোনা। রক্ষণকামি বাজার অর্থনীতিকে লাগাম পরানোর রাজনীতির শূন্যতায় এভাবেই একের পর এক ইলেকশনের ঘন্টা বেজে যায়। পুনঃ পুনঃ আবর্তনে।

সাম্প্রতিক ইস্যু

বেকার সমস্যাঃ এসএসসি কর্মপ্রার্থীদের অনশনের প্রেক্ষিতে

নিয়োগ কমিশন সংঙ্কট

রাজ্য সরকার স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে স্কুল গুলিতে শিক্ষক নিয়োগ শুরু করেন ১৯৯৮ সাল থেকে। ১৯৯৮-২০১১ পর্যন্ত সংখ্যায় কম হলেও নিয়মিত শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে সারা রাজ্যের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলিতে। তখনও দূর্নীতি, স্বজনপোষণ, অস্বচ্ছতার প্রশ্ন ছিল। বিভিন্ন সময় পার্টিজান মানসিকতা থেকে অনেক candidate কে নিয়োগ থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ সামনে এসেছে। তা সত্ত্বেও স্কুল পরিচালন কমিটির নামে স্কুল শিক্ষক নিয়োগের [সরাসরি পার্টি আধিপত্যের] সমাপ্তি ঘোষিত হয়েছিল এসএসসি গঠনের মাধ্যমে।

কিন্তু ২০১১ সালে রাজ্যের ক্ষমতার পালাবদলের পর থেকে এ পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে নানান অনিয়ম এবং তজ্জনিত জটিলতা সামনে এসেছে। বিজ্ঞাপন বের করা থেকে পরীক্ষার ফলপ্রকাশ এবং নিয়োগ পর্যন্ত নানান অস্বচ্ছতা গোটা প্রক্রিয়াটিই অন্ধকারের বিষয় করে তুলেছে। আদালতে কেসের পর কেস জমা হয়েছে। কেসের অজুহাতও সরকার কাজে লাগাচ্ছে। প্রাথমিক ও হাই মাদ্রাসাগুলিতেও একই অবস্থা। পাবলিক সার্ভিস কমিশন, স্টাফ সিলেকশন কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগের ক্ষেত্রের বহুবিধ দূর্নীতির অভিযোগ রাজ্যবাসী গোচরে এসেছে সম্প্রতি।

এরেই আবহে ২০১৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে waiting list এ স্থান পাওয়া কর্মপ্রার্থীরা অনশন শুরু করেছেন। আজ তাদের অনশনের ২৫ দিন। এদের সংখ্যা প্রায় ৪০০ জন। এদের প্রধান দাবী নিয়োগের আইন-কানুন-নিয়ম অনুযায়ী কমিশন নিয়োগ করুন। ২০১৬ সালের বিজ্ঞাপনে ঘোষিত শূন্যপদ এবং ২০১৯ এর মার্চ মাস পর্যন্ত শূন্যপদের সংখ্যা তো এক হবেনা। সরকার আপডেটেড শূন্যপদ ঘোষণা করুক। প্রত্যেক কর্মপ্রার্থীর মোট প্রাপ্ত নম্বর সহ নামের তালিকা প্রকাশ করুক। সেই তালিকা কমিশন প্রকাশ করেনি। এটি করলেই একদিকে অপেক্ষমান তালিকায় থাকা প্রার্থীরা চাকুরি পাবেন অন্যদিকে দূর্নীতিও প্রতিরোধ করা যাবে।

এসএসসির অপেক্ষমান তালিকায় থাকা কর্মপ্রার্থীদের আন্দোলনের পাশে বিরোধী দল সংগঠনগত ভাবে প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। এছাড়া শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতের প্রতিষ্ঠিত কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা এদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এছাড়াও তাদের সমর্থনে অনেকেই খোলা চিঠি লিখেছেন। শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি তাদের সাথে দেখা করেছেন। কিন্তু সমাধান সূত্র বের হয়নি। পরবর্তীতে পাঁচ সদস্যের একটি টিম গড়ে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও দাবীদাওয়ার সুরাহা না হলে আদৌ কোন সমাধান সূত্র আসবে কিনা বলা যাচ্ছে না।

এখন প্রশ্ন হল বিচ্ছিন্ন আন্দোলনগুলির পরিণাম কী পাওয়া যাচ্ছে? এদেরকে চাকুরি দিলে রাজ্যের নিয়োগ সমস্যার সমাধান কি হয়ে যাবে? আপার প্রাইমারি সহ মাধ্যমিক শিক্ষায় নিয়োগের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নিয়োগবিধি এবং তার প্রয়োগের কী হবে? স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে, শিল্প এবং অন্যান্য তথাকথিত স্বশাসিত সংস্থা যেমন পঞ্চায়েত,মিউনিসিপ্যালিটি,কো-অপারেটিভ-প্রভৃতির ক্ষেত্রেও যৎসামান্য নিয়োগেও যে ব্যাপক সংগঠিত

দূর্নীতি তা কি বন্ধ হবে? এবং একই সঙ্গো সরকারি ক্ষেত্রগুলিতে নিয়োগের সম্ভাবনা কতটুকু বাড়তে পারে?

রাজ্যে বেকারত্বের চেহার

২০১৫-১৬ এর পঞ্চম কর্মসংস্থান সমীক্ষা প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে রাজ্যের বেকারদের ১৩.৯শতাংশ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট এবং ৯.৮ শতাংশ আন্ডার গ্রাজুয়েট। শ্রমশক্তির ৪৩.৮ শতাংশ ক্যাজুয়াল লেবার। ৩৪.৫শতাংশের মাসিক আয় ৫০০০ টাকার নিচে। স্বনিযুক্ত ৮০ শতাংশের মাসিক গড় আয় ৭৫০০ টাকা। সারা দেশের মোট কর্মপ্রার্থীর ১৫ শতাংশ বাংলার। কিছুদিন আগে রাজ্য সরকারের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী নিয়োগে আবেদনের সংখ্যা ৬০০০ শূন্যপদের জন্য ২৫ লক্ষ। উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের হার ভয়ানক ভাবে বেড়ে চলেছে। প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে ২০১৫-১৬ সালে বাংলায় প্রতি হাজারে বেকারের সংখ্যা ৪৯। যা সর্বভারতীয় গড়ের সামান্য কম। এই প্রতিবেদন লেখার সময় ২৭ মার্চ ২০১৯ এ সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমির তথ্যে দেখা যাচ্ছে সারা ভারতে বেকারত্বের হার ৬.৮ যার মধ্যে শহরে ৭.৯, গ্রামে ৬.২ । পশ্চিমবঙ্গো এর হার ৬.১ ।

এর কারণ কী? মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রবক্তারা বলছেন, শিল্পে বিনিয়োগ না থাকা।

বেকারত্বের বুনিয়াদি কারণ

কী রাজ্য সরকার, কী কেন্দ্রীয় সরকার ভয়াবহ বেকারত্বের চিত্র। NSSO এর লিক হয়ে যাওয়া তথ্যে ৪৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ কর্মহীনতার ছবি ধরা পড়েছে। শিল্প কর্পোরেটদের সেবা করতে গিয়ে কৃষিকে ছিবড়ে করে দেওয়ায় কৃষিক্ষেত্রেও কর্মসংকোচন আতঙ্কজনক। কৃষি অলাভজনক হওয়ায় শহরে মানুষের ভিড় বাড়ছে। কিন্তু এর অর্থনীতিগত উপায় কী? কেন এত বেকারত্ব? নিয়োগের ক্ষেত্রে কেন তৈরি হচ্ছে না? পরিষেবাক্ষেত্রগুলিতে ছিঁটেফোটা ছাড়া শিল্প ও কলকারখানায় কেন বিনিয়োগ নেই? এই প্রশ্নগুলির উত্তর ছাড়া এর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না।

সম্প্রতি প্রকাশিত আন্তর্জাতিক Right Organization Oxfam এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ভারতের জাতীয় আয়ের বিভাজনে অভূতপূর্ব বৈষম্য ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ পর্বে ঘটেছে। ২০১৮-১৯ এর চিত্রে কী পাওয়া যাচ্ছে? উপরের ১০ শতাংশের হাতে মোট জাতীয় আয়ের ৭৭.৩ শতাংশ কেন্দ্রীভূত। নিচের ৫০ শতাংশের হাতে ৩-৪ শতাংশ সম্পদ। উপরের ১০ শতাংশ ব্যক্তি মালিকানায় (কর্পোরেট) সেই সম্পদ কুক্ষিগত করেছে। এর বিনিয়োগ সে বা তারা মুনাফার ক্ষেত্রছাড়া করবে না। বিশ্বায়ন পরবর্তী MNC গঠিত হওয়ায় তা বিদেশেও বিনিয়োগ হতে পারে। ফলে দেশের সম্পদ বাহির চলে যাওয়াটা এখন আইনানুগ। ৩০ শতাংশ আয়কর ছাড়া আর কোনো বাধা এদের উপর সরাসরি নেই।

কুক্ষি প্রবণতায় এই সর্বগ্রাসীতায় লাগাম দেওয়ার কোনো উদ্যোগ কি রাষ্ট্র পরিচালনার শক্তিগুলোর অভিব্যক্তিতে দেখা যাচ্ছে? না, দেখা যাচ্ছে না। ফলে সরকারের হাতে Tax এর অর্থ ছাড়া আর কোনো টাকা নেই। MNC এর উপর নিয়ন্ত্রণ নাই। অথচ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে নাগরিকদের বিভাজন করে ভোট ব্যাংক অক্ষুন্ন রাখার সতর্ক প্রহরা জারি আছে। আর কী আছে? প্রকল্পের নামে ডোল রাজনীতি। যার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ — কেন্দ্রীয় সরকারের কিষান সম্মান নিধি এবং রাজ্যের কৃষক বন্ধু প্রকল্প। তো ব্যক্তি মালিকানায় জমা হওয়া কাঁড়ি কাঁড়ি ধন আর্থসামাজিকভাবে বিনিয়োজিত না হলে কর্মসংস্থান হবে না। বেকারত্ব আকাশ ছুঁবে এটাই এর পরিণাম।

শ্রেণি রাজনীতি

তথাকথিত কম্যুনিষ্ট ও বামপন্থীরা বিশ্বায়নের অর্থনীতির মুক্তবাজারের সামনে তত্ত্বগত কোনো বিকল্প মডেল হাজির করতে পারেনি। ক্ষমতায় থাকা রাজ্যগুলিতে বিকল্প মডেলের প্রয়োগও দেখাতে পারেনি। বরং সেই রাজ্যগুলিতে একধরনের সামাজিক আধিপত্যবাদ কায়েম করেছিল। যার পরিণামে তাদেরকে ক্ষমতা থেকে সরে যেতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা থেকে ক্ষমতা হারানোর পরে অর্থনৈতিক তত্ত্ব বা বিকল্প উন্নয়ন মডেলের কোনো ঘোষণা তাদের দিক থেকে দেখা যাচ্ছেনা। ইতিমধ্যে অতিজাতীয়তাবাদী চণ্ডশক্তি কেন্দ্রের ক্ষমতা দখল করে —ব্যাপক জনতার কর্মসংস্থান তথা শ্রেণি চেতনার বাস্তবতাকে ভিন্ন ভিন্ন খাপে ঢুকিয়ে দিতে সেন্টিমেন্ট্যাল গোষ্ঠী, ভাষা, ভৌগোলিকতা, সংরক্ষণ, অসংরক্ষণ ইত্যাদি নন ইশ্যুকে ইশ্যু করে সামনে এনেছে। বিরোধী প্রধান শক্তিটির সাইনবোর্ড তো গড়েই উঠেছিল উদার মুক্তবাজার ও বিশ্বায়নের অপকৌশলকে মাঠে নামাবার জন্যই। তাদের তো কাঠামোগত অগণিত সংস্কার ছাড়া অন্য কোনো পন্থা জানা নেই।

আত্মকেন্দ্রিক আত্মপ্রতারণার যে ভিত্তিতে শ্রেণি বিভাজনের সংক্রমণ ঘটে শ্রেণি সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তার মোকাবিলা করে শ্রেণি রাজনীতি। তার নেতৃত্ব দেয় শ্রেণি রাজনীতি। তার জন্য কম্যুনিজমের আদর্শে দিক্ষিত পার্টি থাকতে হয়। তার কালচার থাকতে হয়। অগ্রণি নেতৃত্ব থাকতে হয়। যার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল সোভিয়েত লেনিনের নেতৃত্বে। তাহলে স্বঘোষিত কম্যুনিস্টরা সেই কাজে ব্যর্থ কেন? তত্ত্ব তো হাতের কাছেই। আসলে ব্যক্তি জীবনে তত্ত্বের বস্তুগত এ্যাপ্লিকেশন ছাড়া ডগম্যাটিক তত্ত্ব আওড়ানো তত্ত্বের সাথে ব্ল্যাকমেইল করা। একসময় যার আর্থসমাজে কোন বিশ্বাস যোগ্যতা থাকেনা। সেটিই হয়েছে।

সমাধানী কর্মসূচি

তথ্যের পটভূতিতে তত্ত্ব সামনে আনা যাক। আর্থসামাজিক সম্পদে অধিকার থাকা বা না থাকার প্রশ্নেই বেকারত্ব বা অর্থনৈতিক সংকট। আর্থসামাজিক সম্পদ ব্যক্তিগত মালিকানায় কুক্ষিকৃত হবার প্রবণতার পরিণাম তো পরিস্কার। বেকারত্ব, দারিদ্র, পণ্য মানসিকতা, হিংস্রতা, সহিংসতা, জাতিগত, বর্ণগত, ভাষাগত, তথাকথিত ধর্মগত অসহিষ্ণুতা-- এই অর্থনৈতিক শ্রেণি যাতনারই প্রকারন্তর বহিঃপ্রকাশ। আমাদের সামনে তাই গোড়ার প্রশ্ন— ব্যক্তি কুক্ষির সূত্রটি কী? ব্যক্তি কুক্ষির সূত্র হল মানব সত্তার আত্মকেন্দ্রিক আত্মচক্রান্ত। কী এই আত্মকেন্দ্রিক আত্মচক্রান্ত?

আত্মকেন্দ্রিকতায় ব্যক্তি সত্তা আর্থসামাজিক সম্পদকে নিজের মনে করে কুক্ষিগত করতে থাকে। যাতে সত্তার স্বরূপ তখন যক্ষ। যক্ষ যখন কুক্ষিগত ধন সামলানোর ক্রুর চক্রী তখন সেই সত্তায় রক্ষ। পুরাণ বর্ণিত এই যক্ষ-রক্ষের সংক্রামিত আর্থসমাজ তখন কিস্কিন্ধ্যা। কিস্কিন্ধ্যায় মানুষের বস্তু পরিচিতি কী? না, লঙ্কা অর্থাৎ এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। যার অপর নাম আত্মকেন্দ্রিক আত্মগুহা। এই আত্মকেন্দ্রিক আত্মগুহায় আবন্ধ থেকে যক্ষ-রক্ষের বিরুধ্বে লড়াই করা যায়? যায় না। সেজন্যই আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে আত্মবিকেন্দ্রিক জীবনায়নের কালচারাল-পলিটিক্যাল কর্মসূচি গড়ে তোলাটাই আজকের জরুরী প্রয়োজন। এই কালচারাল কর্মসূচিতে শ্রম-উৎপাদন-মূল্য-মূল্যবিভাজন-আবশ্যিক-উদবৃত্ত ব্যখ্যাত হয়ে আর্থসমাজে প্রযুক্ত হতে পারে। ব্যক্তির সত্তা পরিচিতি শিল্পের বিষয় বস্তু রূপে রসবোধের ব্যঞ্জনে অনুভুতির তারে আঘাত হানলে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তাই সরস্বতীর বীণা ঝংকার অর্থাৎ জীবন শিল্পের উদবোধনে সেই কিস্কিন্ধ্যা অর্থাৎ আর্থসামাজিক

অন্ধকারের উন্মোচন। তাতেই সত্তা ও আর্থসমাজের অন্ধকার ভেদ করে উঠে আসে যুগ পান্ডব। সেই পান্ডবী নেতৃত্বে কুরুক্ষেত্র রূপ আর্থসামাজিক বিজয় অর্জন। এই বিজয়ে 'দূর্যোধন' রূপ ধনাবর্জনা আর্থসামাজিক সম্পদ রূপে 'স্বর্গে' [স্বর্গ যা স্ব এর গৈ অর্থাৎ আত্মবিকেন্দ্রিক জীবনায়ন] প্রথমেই পৌঁছে যায়। তার সদ্গতিও হয়। প্রয়োজনানুগ বিন্যাসের মধ্য দিয়ে। যে প্রজ্ঞা এই বিজয় অর্জনী ও বিন্যাসন বাস্তবায়ন করে তাই রাজনৈতিক প্রজ্ঞা।

ব্যাপার স্যাপার তো জটিল হয়ে গেল। কোথায় অনশন আর কোথায় তত্ত্বের কচকচি? তাই কি ? লিঙ্ক করা যাচ্ছে না?

অতএব তত্ত্বের বিশদীকরণে আর না গিয়ে তাকে কর্মসূচি রূপে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা যাক—

১। নাগরিক ঔচিত্যবোধের জাগরণ- যা অনশন ক্লিষ্ট মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে কখনো কখনো জেগে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। অনুশীলনে যা মিলিয়ে যায় না।

২। প্রায়োগিক বস্তু-লগ্ন হওয়া— আজকের আমার সমস্যা কালকের তোমার। আমি লঙ্কা, তুমিও তাই। সত্তাগত এই বিচ্ছিন্নতায় যক্ষ-রক্ষেরই পোয়াবারো। পরস্পর সংযুক্ত হওয়া।

৩। বস্তু বিচ্ছিন্নতার উৎপাটনে ভাষা, ধর্ম, বর্ণ,শাস্ত্র, ঐতিহ্যের বস্তুগত মূল্যায়নে সেন্টিমেন্ট রিফর্ম করা।

৪। তা করতে গেলে অর্থনীতি, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি—এর বস্তুগত অধ্যয়ন শুরু করা। অর্থাৎ ব্যক্তির নৈব্যক্তিক চরিত্র গঠনে সাংস্কৃতিক অনুশীলন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালন।

শর্ট কার্ট কোনো পথ নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে আয়াস ছাড়া বিজয় অর্জনের কোনো দৃষ্টান্ত নেই।

শিক্ষায় মূল্যায়ন ব্যবস্থাপনা

মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৯

আমাদের রাজ্যের এই বছর ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা আরম্ভ হয় বিভিন্ন কেন্দ্রে। আর সমাপ্ত হয় ২২ ফেব্রুয়ারি। মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১০ লক্ষ ৬৪ হাজার ৯৮০ জন। গত বছরের তুলনায় ১৮ হাজার কম। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন 'নেগেটিভ বার্থ রেট' এর জন্য এই বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা গতবারের তুলনায় কমে গেছে। নেগেটিভ বার্থরেট এর কারণ নাকি স্কুল ড্রপ আউটের তথ্য গোপন করতে এ তত্ত্বের আমদানি, তা নিয়ে বিতর্ক কম নেই। যাইহোক, এবারে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, পরীক্ষার সবকটি পেপারের প্রশ্ন, এক্সাম শুরুর (শুরু হয় সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট থেকে) আগে বা কিছুসময়ের মধ্যেই মোবাইলের হোয়াটসঅ্যাপে চলে এসেছে। অর্থাৎ কিনা প্রশ্ন ফাঁস হয়ে গেছে। এই পরীক্ষার মূল দায়িত্বে ছিলেন ভেনু ইনচার্জ, ভেনু সুপার ভাইজার ও অতিরিক্ত ভেনু সুপারভাইজার। উল্লেখ যে, স্কুলের হেড মাস্টার সহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ কেবলমাত্র পরীক্ষা হলের ইনভিজিলেটর রূপেই ছিলেন। আর ঐ মূল দায়িত্বের কর্তাব্যক্তি ছিলেন মূলত সরকার বা পর্ষদের মনোনীত। এখন প্রশ্ন হল এতসব কিছু লয়লস্কর থাকা সত্ত্বেও প্রশ্নপত্র কেন ফাঁস হল? আর এক-দুটো প্রশ্ন নয়। বলতে গেলে সবকটি পেপারের প্রশ্নই ফাঁস হয়েছে। এর জন্য কয়েক জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়। সিআইডিও এর তদন্ত শুরু করে। তারা জানায় যে, মোবাইলের মাধ্যমে এই কাজ হচ্ছে। কিন্তু তারা সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। যেখানে পরীক্ষার হলে মোবাইল নিয়ে পরীক্ষার্থী ও ইনভিজিলেটর কারোর প্রবেশাধিকার ছিলনা। শিক্ষক সংগঠনগুলি মূল দায়িত্বে থাকা এবং পর্ষদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৯

এই বছরের HS পরীক্ষা আরম্ভ হয় ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে এবং সমাপ্ত হয় ১৩ মার্চ। পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রতিটি হলে ২০:৩ জন করে ইনভিজিলেটর ছিল। একজন মোবাইল চেকার ছিলেন। কোনো প্রশ্ন ফাঁস হয়নি। কিন্তু যারা ইনভিজিলেটর ছিলেন তাদের বক্তব্য হল যে, পরীক্ষার্থীরা খুবই বিশৃঙ্খলভাবে পরীক্ষা দিচ্ছিল। মাধ্যমিক এক্সামের চাপে শিক্ষামন্ত্রী প্রচণ্ড চাপে ছিলেন এই HS এক্সাম নিয়ে। কোথাও কোথাও ইনটারনেট পরিষেবাও বন্ধ রাখা হয়। যার ফলে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটেনি।

এখন দেখার বিষয় যে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাকগ্রাউণ্ড কোথায় লুকিয়ে আছে। যারা এই মূল্যায়নী ব্যবস্থার সাথে সংশিষ্ট, তাদের কেউ না কেউ এই অপকাণ্ডের সাথে জড়িত। সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তি গোষ্ঠী শিক্ষকও হতে পারে, আবার পর্ষদের কর্তাব্যক্তিরাও হতে পারে। আবার এদের বাইরেও কেউ হতে পারে। সে যেই হোক, এই অপঘটনার পিছনে যে মানসিকতার সংক্রমণ ঘটেছে সেটা বিশ্লেষণেই এর রুটটি ধরা যাবে। কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট যে, যারা এই কাজের দায়িত্বে ছিলেন, তাদের মধ্যে সামাজিক নৈতিকতার বিপরীতে থাকা অংশটিই সেখানে ডমিন্যান্ট। যার পরিণামে এইরূপ বিকৃতির সংক্রমণ। সামাজিক নৈতিকতার এই অবক্ষয় কেন ঘটল?

এরজন্য একটু একাডেমিক শিক্ষা অঙ্গানের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। পশ্চিমবঙ্গার বেশ কিছু সমীক্ষায় দেখা গেছে যে স্কুল শিক্ষায় প্রায় ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ

ছাত্র নিজেদের নাম ঠিকানা সঠিকভাবে লিখতে পারে না। তারা আক্ষরিকভাবেই কিছু শিখতে পারেনি। কিন্তু তারা যে পরীক্ষায় রেজাল্টে কম নাম্বার পেয়েছে তা নয়। তারা ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ নাম্বারও পেয়েছে। এই দায়ভার কাদের উপর বর্তায়? একাডেমিক শিক্ষার সাথে যুক্ত সমস্ত কিছুর উপর। পাঠক্রম, মূল্যায়ন ব্যবস্থা, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার পরিচালন কমিটি, পরিদর্শক, শিক্ষা পর্ষদ প্রমুখ এর জন্য দায়ী। কিভাবে?

এই শিক্ষার পদ্ধতি ও মূল্যায়ন ব্যবস্থায় ২০০২-০৩ সাল থেকে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, আমাদের শিক্ষা পরিচালন সংস্থা। সেখানে সিলেবাসে বিষয়গুলিকে এমনভাবে বিন্যাস করেছেন যে, বিষয়গুলির গভীরে যাওয়া হয়নি। সবই তথ্যভিত্তিক করা হয়েছে। এমনকি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একই হাল। ছাত্ররা শিক্ষকের থেকে এই সব তথ্য শিখেছে, জেনেছে। কিন্তু বিষয়টির সম্পর্কে তারা কোনো কিছুই জানেনি। কেবল তথ্যমুখস্থ করে গেছে। যার পরিণামে আজকে যখন কোনো গ্র্যাজুয়েট কিংবা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তুমি তো দর্শনে এমএ পাশ ফাস্ট ক্লাস, আচ্ছা বলতো দর্শন কাকে বলে? কিংবা অন্যান্য সাবজেক্টের ক্ষেত্রের ছাত্রদের, তখন সে বা তারা নির্বাক হয়ে ফ্যাল ফ্যাল চাহনিতে ইতি উতি করতে থাকে।

আর ঐ ধরণের সাবজেক্টগুলির যখন তথাকথিত পদ্ধতিতে (অনেক রঙ চঙ বাহারি মূল্যায়নী কৌশলও এসেছে, যেমন— CCE, Summative, Formative etc.) তাদের মূল্যায়ন করা হয়, সেখানেও বেশি করে স্কোর করার কথা মাথায় রেখে ১০০ নম্বরের মধ্যে ২০ মার্কস প্রজেক্ট, বাকি ৮০ এর মধ্যে ৮০ শতাংশ তথ্যভিত্তিক multiple choice type questions থাকছে। তারা ১০০ য় ৭০ থেকে ৮০ নম্বর এমনি পেয়ে যাচ্ছে। আর এই সকল প্রশ্নের উত্তর ভরাট করতে হল ম্যানেজ সহ অন্যান্য বিষয়গুলি আজ ছাত্রদের কাছে একটা অধিকারে দাঁড়িয়ে গেছে। যারা এক্সাম নেন এবং যারা দেয় তারা মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে।

একাডেমিক শিক্ষার এই সামাজিক নৈতিকতার ভিত্তি পাঠক্রম ও শিক্ষকদের দায়িত্ব কর্তব্যের মধ্য দিয়েই টিকে ছিল। সেখানে এর বিপরীত মানসিকতার ব্যক্তি মানস ঘাপটি মেরে থাকত। তারা প্রভাবের জায়গায় ছিল না। আজ সেই স্থান দখল করেছে সেই নীতি-নৈতিকতাহীন, দায়িত্ব-কর্তব্যের ফাঁকিবাজি ব্যক্তি মানস। আর পাঠ্যক্রমিক বিন্যাস ও মূল্যায়নী কৌশলের সারবত্তাহীনতা তাতে আরও বিকৃতির সংক্রমণের জাল বিস্তারে অনুকূলে কাজ করেছে। বিকৃত অর্থনীতির উপর ভরকরা আর্থসমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষার একাডেমিক অঙ্গনে কিছুটা হলেও নৈতিকতার শিক্ষা, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ও অর্থনীতি বিষয়ে গভীরে তলিয়ে দেখার একটা পরিবেশ ছিল। তা আজ শেষ। আগামিতে যার সংক্রমণে আর্থসমাজের সর্বত্র পড়তে যাচ্ছে। এখনি তার উপসর্গ দেখা দিয়েছে। আমাদের একাডেমিক শিক্ষা থাকছে কিন্তু সেই ভিত্তিক জ্ঞান থাকছে না। থাকছে কেবল তথ্য। তথ্য দিয়ে কী জীবন চলে? চলে না।

তথ্য কী? তথ্য হল আপেক্ষিক আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানের প্রশ্নবাচক প্রেক্ষিত। সেই প্রেক্ষিতের পরিচয় থাকতে হয়। কিন্তু সেই প্রশ্নমালা প্রণয়ন ও উত্তর সন্ধানের গভীরে থাকতে হয় জ্ঞান। তথ্য জ্ঞান নয়। জ্ঞানের ইনফরমেশন। জ্ঞানের ইনফরমেশন আর জ্ঞান এক নয়। যেমন মহাভারত, রামায়ন, হল মানব জীবনেকে কীভাবে গঠন করলে আর্থসামাজিক শান্তি

প্রতিষ্ঠা করা যায় তার নিয়ম সম্বলিত প্রতীকী জ্ঞানতত্ত্ব। কিন্তু এই জ্ঞানতত্ত্বের তথ্য পরিচিতি থাকলেই হয় না। তার গভীরে মনন দিয়ে সেই জ্ঞান অর্জন করতে হয়। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় তথ্যই প্রধান ভূমিকা নিয়ে নেওয়ায় জ্ঞানভিত্তিক জীবন গঠন অধরা থেকে যাচ্ছে।

তাহলে উপায়?

উপায় অবশ্যই আছে নিজের দিকে সার্চলাইট ফেলা। সেখানেই নিহিত ব্যক্তির নিষ্ক্রিয়তার অপশক্তি। যাকে লাগাম পরিয়ে ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণী ব্যবহার করানো। জীবনের কর্ম সম্পাদেনর নিরিখেই তাকে ধরা। আর ধরে প্রয়োজন মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অর্থাৎ সংস্কৃতির কষর্ণেই নিহিত ব্যক্তি ও আর্থসমাজের শিক্ষাসহ অন্যান্য ব্যবস্থাপনা। কিন্তু সেখানের নেতৃত্ব ও অর্থনীতির ব্যবস্থাকে অবশ্য মানবতাভিত্তিক শক্তির হাতে থাকতে হবে।

শিক্ষার মূল্যায়নের আগে তাই শিক্ষার সিলেবাস ও প্রশ্নমালা নির্বাচনে জ্ঞান ও তথ্যের পৃথকীকরণ একান্ত জরুরী। সিলেবাস প্রণয়ন ও মূল্যায়নী ব্যবস্থাপনায় সাধারণ এই নিয়মটি নিয়ে আসা বিরাট সাগরপাড়ি দেওয়া নয়। নীতি নির্ধারকরা এদিকটিতে নজর দিলে উল্লিখিত সমস্যাগুলির সমাধানে প্রাথমিক ধাপ অতিক্রম করা যাবে বলে মনে হয়।

ভয়েস মার্ক

আর্থসমাজ সংস্কৃতির বিশেষক পত্রিকা

গল্প, কবিতা, নাটক/নাটিকা, প্রবন্ধ, সাম্প্রতিক আর্থসামাজিক ঘটনা সমূহের বিশ্লেষণ ইত্যাদি চর্চার মাধ্যমে ভয়েস মার্কের পথ চলার সাথী হোন।
লেখা পাঠান পত্রিকার ঠিকানায় বা ইমেলে।

যোগাযোগঃ 9434655610 / 9932607714
Email: voicemark19@gmail.com

প্রবন্ধ

জাকাত প্রযুক্তিঃ ইতিহাসের অতীত ও বর্তমান

বিশ্লেষণ- আযাদ রহমান

জীবনের ছন্দগত সজ্জার কোন অনাপেক্ষিক স্কেল নেই। স্থান-কাল বিশেষিত মানুষের আপেক্ষিক আর্থসামাজিক উৎপাদনে সৃষ্ট মূল্যে তার ভোগ বাঞ্ছার অভিব্যক্তি হিসেবে তা রূপ নেয়। কিন্তু এই রূপ সজ্জা তার বস্তুলক্ষের বিরোধী নয়। যেমন গৃহসজ্জার সৌন্দর্য বোধ ও প্রাপ্তব্য উপাদান কি জীবনের সামগ্রিক বস্তু লক্ষ্য বিরোধী? বিরোধী নয়। বিশেষ স্থান-কালে বিশেষ জনপদে বিশেষ ব্যক্তি তার সৌন্দর্যবোধ কতটা বিকশিত করেছে সেই মাপকাঠিতে তার গৃহসজ্জার বাস্তবতা নির্ণিত ও রূপায়িত হয়। নর ও নারীর রূপ চর্চার ক্ষেত্রেও একই কথা। কিন্তু তার সৌন্দর্যবোধ জড় উপাদানে রিপ্লেসড হয়ে গেলে জীবনের বস্তু ভোগ লক্ষ্য বিঘ্নিত হয়। জড় উপাদানের প্রাধান্যে অন্তসারশূন্যতায় তা জীবনকে ভোগসুন্দর করে গঠনও করেনা, জীবন ভোগগত বাঞ্ছার তৃপ্তি, হয় না।

অতৃপ্তি ও তার কারণ

মানব সত্তার জন্ম লগ্নেই তাতে নিহিত হয়ে যায় পদার্থ শক্তি ও চেতনিক শক্তির দ্বৈরথ। ধীরে ধীরে দেহটি একটু একটু করে বেড়ে ওঠে। একসময় সুপ্ত চেতনিকতা জেগে ওঠে। যৌন ও আনুষঙ্গিক বোধগুলি জেগে উঠতে থাকে। পদার্থ শক্তির প্রাধান্য হেতু চেতনিক নিয়ন্ত্রণের জন্য এই দুই শক্তির দ্বন্দ্ব জাগাতে হয়। কারণ পদার্থ শক্তির প্রাধান্যে সে প্রবৃত্তির বশে থাকে। যে প্রবৃত্তিক পরাধীনতায় হল তার অতৃপ্তির কারণ। এই কারণ উৎসাদন করতে গেলে চেতনিকতাকেই প্রাধান্যে আনতে হয়। তাতেই দ্বন্দ্ব তত্ত্ব। তাই অতৃপ্তি থেকে মানব জাতির এই তৃপ্তি অন্বেষাতেই তার যুগান্তকারি সৃষ্টি বিপ্লব। তা রাজনীতি, অর্থনীতি, কলা, বিজ্ঞান সবক্ষেত্রেই।

বিষয়টিকে সরল করলে কী দাঁড়ায়? মানব সত্তা পদার্থ ও চেতনিক শক্তি নিয়ে গঠিত। জন্মসূত্রিক পদার্থ শক্তির প্রাধান্যের কারণে তাতে চেতনিক শক্তি সুপ্ত। পরিণামে সে প্রবৃত্তি চালিত। প্রবৃত্তির সে চালক নয়। কিন্তু প্রবৃত্তি তথা জড় তাড়নাতে সে তৃপ্তি পায়না। তাকে সেই প্রবৃত্তিকে বশে আনতে হয়। আনতে হয় চেতনার শক্তি দিয়ে। তার জন্যই তাকে দ্বন্দ্বে আসতে হয়। এই দ্বন্দ্বের উত্তোরণে চেতনার শক্তিতে তার দেহগত পদার্থ শক্তি নিয়ন্ত্রিত হলে তবেই জীবনের রূপ -রস-স্বাদ-গন্ধ তার তৃপ্তি ছন্দে সাড়া দেয়।

জ্ঞান-শ্রম-যৌনতা

মানব জাতির এই তৃপ্তি অন্বেষার একটি ধারা জ্ঞান-শ্রম -যৌনতা। জ্ঞান হল তা-ই যাতে সে নিজেকে ও তার আর্থসমাজকে সম্যক ভাবে জানে। জানার এই শক্তি যখন প্রায়োগিক প্রকল্পে রূপ নেবার ক্ষমতা অর্জন করে তখন তার নাম প্রজ্ঞা। কীসের ভিত্তিতে তা প্রযুক্ত হবে? শ্রমের ভিত্তিতে। অর্থাৎ শ্রম কেবল তার দেহগত

অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জনই নয়। তার নিজেকে বিসর্গিক করার জন্যও। অর্থাৎ তা তা তার জীবনের বস্তু লক্ষ্যের জন্যই।

জ্ঞান আর শ্রমের যুগলবন্দি তার কাঙ্খিত পরিণতি আনতে পারেনা যদি তাতে দাম্পত্যের সুস্থ যৌন জীবন না থাকে। দাম্পত্যের যৌন জীবন ছাড়া শ্রমের ইউনিট হিসেবে ব্যক্তি স্থানু অর্থাৎ বিকাশশীল নয়। যা তার তৃপ্তি অর্জনের বাধা বিশেষ। এই জন্য বস্তুবিজ্ঞানের অন্যতম দাম্পত্য তত্ত্ব। বাস্তবানুগ দাম্পত্যের পরশপ্রীতি সেই তৃপ্তি ছন্দের আবশ্যিকতা। যা পরবর্তী জেনারেশনের জীবন বীজ।

অতৃপ্তি থেকে জীবন জিজ্ঞাসা আর তার উত্তোরণে জ্ঞান -শ্রম-যৌনতার ধারায় বাস্তবানুগ জীবন ভোগ।

জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রাম

মানবতার শত্রু অর্থাৎ তারই সত্তার নেগেশন কি এত সহজেই বাস্তবানুগ জীবন ভোগের রাস্তা মানুষকে ছেড়ে দেয়? দেয় না। মানুষ যতক্ষণ তার দেহগত পদার্থিক প্রবৃত্তি চালিত ততক্ষণ সে মানস রক্ষণকাম প্রবণ। এই মানস রক্ষণকামের স্বরূপ হল প্রবৃত্তির আড়ালে চেতনাকে ঢেকে দিয়ে শ্রম তথা মূল্য চুরি করা। অর্থাৎ শ্রমমূল্যের অনধিকার দখলদারি। মানস রক্ষণকাম বৃত্তি হল তার মানস পুঁজি। মূল্য কুক্ষি করতে শুরু করে দিলে অর্থাৎ চুরির মূল্য যা পরে পরিণত হয় পুঁজি মানসে। এই পুঁজি মানস আর্থসামাজিক সম্পদের কুক্ষির মাধ্যমে চেতনা তথা মানবতার উপর অত্যাচার শুরু করে। এতেই ব্যহত হয় আমিত্ব প্রেম তথা বাস্তবানুগ জীবন ভোগ।

আর তার জন্যই ব্যক্তিকে দ্বিমুখি সংগ্রামে সংগ্রামি হতে হয়। কেমন? জ্ঞান-প্রেম ধারায় জীবন ভোগ ব্যহত হলে চেতনা তথা আমিত্বকে তার শাসন বলবত করতে সংগ্রাম শুরু করতে হয়। কার সাথে সংগ্রাম ? সেই মানস রক্ষণকাম বৃত্তির সাথে তার আমি অর্থাৎ চেতনার সংগ্রাম।

এই সংগ্রামের ভিত্তি জ্ঞান। অর্জিত জ্ঞান ও তার উপলব্ধিগত বিশ্বাস অর্থাৎ শক্তিতে এই সংগ্রাম পরিচালিত হয়।

সংগ্রাম পদ্ধতি

এই সংগ্রাম পরিচালনার পদ্ধতি হল শ্রমতত্তাবধায়ক রণনীতি। শ্রমিক শ্রম দিল। মূল্য উৎপাদিত হল। উৎপাদিত মূল্যের বিভাজন হল। বিভাজনে আবশ্যিকের স্বীকৃতি। যে স্বীকৃতিতে মূল্যের অপর অংশ অর্থাৎ উদবৃত্তের নিয়োজনের জাকাত প্রযুক্তি। এই জাকাত প্রযুক্তি আমিত্ব প্রতিষ্ঠা বা সলাত কায়েম বা বাস্তবানুগ জীবন ভোগ প্রতিষ্ঠার রণনীতি নির্ধারক। এর অর্থ শ্রম মূল্যের আমিত্ব ভোগবাচক ত্যাগের আমিত্ব যোগ্যতায় চেতনাকে বিজয়ী, অধিষ্ঠিত ও প্রতিষ্ঠিত করা।

আমিত্ব ভোগবাচক ত্যাগ সে আবার কী? শ্রমিকের উৎপাদিত মূল্যের আবশ্যিক অংশ বাদে যা অতিরিক্ত তা তার নয়। তা আর্থসমাজের। কিন্তু মানস রক্ষণকাম বৃত্তির গোপন ছলায় তা ব্যক্তি কুক্ষিতে আটকা পড়ে গেলে আমিত্ব ভোগ অর্থাৎ জীবন ভোগ অর্থাৎ চেতনার বস্তুগত জীবন ভোগ তখন অপ্রাপ্য। তাই বাস্তবানুগ জীবন ভোগ লক্ষ্যে ব্যক্তির প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যক্তির কাছে অবাঞ্ছিত। এই অবাঞ্ছিত মূল্যই দূর্যোধন। এই দূর্যোধনী ধনাবর্জনা বহন করে জীবন ভোগ করা যায় না। তা ত্যাগ করতে হয়। কোথায় ত্যাগ করতে হয়। না কোন ব্যক্তিগত দান নয়। কারণ দাতার অহমিকা আর গ্রহীতার হীনতা জীবনকে ন্যুজ কুব্জই

করে দেয়। মানুষ তাতে নানান মানস বন্দিত্বে আটকে পড়ে। তাই আবর্জনা রূপ ধন কে আর্থসামাজিক ট্রাস্টে অর্পণ করতে হয়। এই ট্রাস্টে অর্পিত সম্পদেরই আর্থসামাজিক তত্ত্বাবধানে বিনিয়োগ ঘটাতে হয়। যা কর্মক্ষেত্র সহ যাবতীয় কল্যাণ খাতে ব্যয় যোগ্য।

ইসলামে জাকাত প্রযুক্তির রূপায়ন

হযরত মুহাম্মদের (সঃ) নেতৃত্বে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক মক্কাবিজয়ের মধ্যে দিয়ে জাকাত প্রযুক্তি বাস্তবায়ন ঘটানো হয়েছিল। যা তাঁর প্রয়ানের পর তাঁর চারজন অনুসারী বলবত রাখেন ৬৬১ সাল পর্যন্ত। সমকালীন আর্থসমাজ যে ব্যবস্থাপনার বস্তু ভোগ বাস্তবিকভাবেই করেছিল। কিন্তু রক্ষণকাম তো চুপ করে থকেনা। খোলাফায়ে রাশেদিনের থেকে ক্ষমতা ছিনতাই করে সে বংশানুক্রমিক ক্ষমতা রীতি চালু করে দেয়। আর একই সঙ্গে জাকাতের কৃৎকলাকে হাতে তোলা দানে পর্যবসিত করে। যা মানস বন্দিত্বের সংক্রমণে মানুষকে ছিটকে ফেলে দেয় জীবন গ্যাপ তথা জেনারেশন গ্যাপের কবলে। রক্ষণকাম ইসলামকেও তথাকথিত অনুষ্ঠান সর্বস্বতায় পরিণত করে দেয়। মানব মুক্তির অখণ্ড জীবন তত্ত্ব এভাব অকেজো হয়ে যায়।

কম্যুনিজমে জাকাত প্রযুক্তির রূপায়ন

ঐতিহাসিক ইসলামে জাকাত তথা উদবৃত্ত মূল্য প্রযুক্তি রক্ষণকামি কুচক্রে অকেজো হয়ে যাওয়ার পর পৃথিবীর ইতিহাসে দীর্ঘ যুগ ধরে রক্ষণকাম জাঁকিয়ে বসে থাকল। মানবতার বুকের উপর শ্বসান কালীর করাল ছায়ার মত। জাকাত তথা উদবৃত্ত মূল্য নিয়ে কোন গবেষনা হলনা। শিল্প বিপ্লবোত্তর ইউরোপে রক্ষণকামি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ মাথা চাড়া দিল। উৎপাদিত রাশি রাশি উদবৃত্ত ব্যক্তি মালিকানায় কুক্ষি হয়ে পড়া থেকেই এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের জন্ম। কিন্তু তা কি জীবনের বস্তুগত ভোগ বাঞ্ছার তৃপ্তায়নে জীবনকে রসসিক্ত প্রানবন্ত করতে পারল? পারল না। বলেই আর্থসমাজে জিজ্ঞাসার ভ্রূন বস্তুগত দাম্পত্যের যৌন মুক্তিতে যুগান্তকারী মেধা প্রতিভার গর্ভায়ন ঘটাল। অষ্টাদশ উনবিংশের এই যৌনমুক্তি বিংশের কম্যুনিজমের লালঝান্ডা হয়ে দেখা দিল। সেই মেধা প্রতিভার মধ্যে প্রধোঁ ফয়েরবাখ হেগেল হয়ে কার্ল মার্ক্স এবং ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস।

মার্ক্স তাঁর গবেষনায় উদবৃত্ত মূল্য তত্ত্ব মানব জাতিকে উপহার দিলেন। যার যুগ প্রযোক্তা লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত বিপ্লবের লাল শিখা। যে বিপ্লব উদবৃত্ত মূল্য প্রযুক্তির সমকালীন প্রয়োগ ঘটালেন। আর্থসামাজিক বাস্তবানুগ জীবনের ভোগ বাঞ্ছা তৃপ্ত হল। জীবন ভোগ করল। সেই বিপ্লবের জীবন সংগ্রামী সংগ্রাম পদ্ধতিও সেই জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রাম এর আপেক্ষিক তত্ত্ব।

একদিকে বিশ্বরক্ষের চক্রান্ত আর অন্যদিকে লেনিনোত্তর সোভিয়েত নেতৃত্বের বস্তু বিচ্যুতিতে সোভিয়েত শ্বেত কপোত বিংশের নব্বই এর দশকে পিছু হটল। ক্রেমলিন থেকে নেমে গেল লাল পতাকা।

যে হাজার বছরের জীবন গ্যাপ কম্যুনিজম তত্ত্বে মানুষকে তার বস্তু লক্ষ্য অর্জন করাল রক্ষের কুচক্রে তা আবার পরাজিত হয়ে জীবন খুঁজে বেড়াতে থাকল।

জাকাত ব্যার্থতায় কর্পোরেট কুক্ষি

সোভিয়েত উত্তর পৃথিবীতে রক্ষণকামিতা তার রঙ রূপ বদলে আজ মালটিন্যাশনাল কর্পোরেট। মানবতার বিকাশেয় উদবৃত্ত মূল্য পকেটস্থ করতে আজ সামনে কোন বাধা নেই। সেই বিশ্বায়নের বিশ্ব-মুক্তবাজার তার সামনে উন্মুক্ত। শ্রম চুরি আর মূল্য দখলে মানবতার

উপর সে ভয়ঙ্কর থাবা চাপিয়েছে তার অপসারণ ব্যতিত মানুষের বস্তুগত জীবন ভোগ তথা জীবন মুক্তি সম্ভব নয়। আর্থসামাজিক সম্পদের দখলদারি ও তার পরিণাম নিয়ে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সমীক্ষাগুলিতে প্রকাশ বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে সম্পদের কেন্দ্রিভবন অভূতপুর্ব। হাতে গোনা কয়েকটি কর্পোরেট গোষ্ঠীর হাতে পৃথিবীর সিংহ ভাগ সম্পদ কুক্ষিগত। সেই সম্পদের পাহারাদারির জন্য দেশে দেশে কত না আইন! রক্ষণকামি চক্রান্তে তাদের ধন পাহারদার হিসেবে গণতন্ত্রের ছদ্ম ছায়ায় শক্তিশালী (?) নেতাদের জোগানে বেড়ে গেছে। তাদের শক্তিশালিতার কেতায় অধিকার হারানো জনতা অন্ধকারের অতলে নিমজ্জিত। আর কর্পোরেট ধনকুবেররা ক্ষমতার স্বর্গরাজ্যের অধিশ্বর!

ধনের সীমাহীন কুক্ষিতে দারিদ্রের সংক্রমণের সাথে সাথে আর কতই না সংক্রণে আর্থসমাজ সংক্রামিত তার ইয়ত্বা নেই। সন্ত্রাস, উঞ্ছবৃত্তি, যৌনবৃত্তি, ভিক্ষা্বৃত্তি ইত্যাকার অসংখ্য।

পাণ্ডব তত্ত্বই জাকাত প্রযুক্তির বাস্তবায়ন করে

রক্ষের সাঁড়াশি আক্রমণে মানবতা পরাজিত হয়ে গেলে রক্ষের বাজিমাত হয় ঠিকই। কিন্তু তা কতদিন? রক্ষ সংক্রামিত কিস্কিন্ধ্যা থেকে আর্থসমাজ মুক্ত হতে পারে একমাত্র সমাকাল পান্ডব তত্ত্বের বাস্তবায়নে। যে পাণ্ডব তত্ত্ব জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রামের ত্রিশূল হাতিয়ারে সজ্জিত হয়ে জাকাত প্রযুক্তির বাস্তবায়নে রক্ষকে পরাজিত করতে পারে। আর্থসমাজে সংখ্যালঘূ পাণ্ডবদের জীবন সাধনায় ব্যক্তি তথা আর্থসমাজ সত্তার নেগেশন আয়ত্ব করণে উদবৃত্ত মূল্যের বিন্যাসের মাধ্যমে আর্থসামাজিক স্বর্গ রচনা করতে পারে। অনাপেক্ষিক জীবন চিত্র মহাভারতে যা কুরুক্ষেত্রিক সমাধানে যুধিষ্ঠিরের স্বশরীরে স্বর্গারোহন।

তার আর্থসামাজিক কর্মসূচি? যা বনবাস তত্ত্ব। বনবাস মানে আর্থসমাজ ছেড়ে বনবাসি হওয়া নয়। রক্ষের থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আমিত্ব গঠন। আমিত্ব গঠনে অর্জিত শক্তিতে রক্ষের মোকাবিলা।

আমিত্ব গঠন মানে মানব দেহমনের বস্তুগত শৃঙ্খলায় আর্থসামাজিক তথা দলগত ঐক্যবদ্ধতার সাংস্কৃতিক কর্মসূচি। এই সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে একদিকে থাকে কর্পোরেটি খপ্পরে আর্থসামাজিক সম্পদকে ধনরূপে দখল করে যে দূর্যোধন আর্থসামাজের দন্ডমুন্ডের কর্তা সেজে বসেছে তাকে উৎখাত করার সাহিত্য বাস্তবতার নির্মান অর্থাৎ স্বরস্বতির সাধনা। সেই সাধনায় জনমনে রক্ষ সংক্রামিত ধর্ম-অধর্ম, জ্ঞান-অ-জ্ঞান-খল জ্ঞান, নীতি-অনীতি-দূর্নীতি, সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গল, প্রযুক্তি-চক্রান্ত প্রভৃতির স্বরূপ উন্মোচন। যার পরিণতিতে মনের কামনা থেকে বাসনা ও এষণার ক্রমোত্তরণে গণ থেকে জন ও রণ নেতৃত্বের পান্ডবী দল গঠন।

যে পান্ডব দল ভাবের সংস্কৃতিকে রাজনৈতিক প্রযুক্তিতে ভোগের বস্তুতে রূপ দেয়। যা মানুষের স্বর্গ।

সবুজ বিপ্লব থেকে অতি সবুজ বিপ্লব

অনুপম পাল

সবুজ বিপ্লব না হল্যে কি ভারতের এতো মানুষকে খাওয়ানো য্যেত্যো, এত্যো উৎপাদন বেড়্যাচ্ছ্যে।? এগুল্যা আপোনি জানবেক লাই। ১৯৬৫-৬৬ সালে তখ্যন খাবার ছিল্যি না, আমরা ভাত না প্যাইয়্যে মাইলো ভূট্টা খাইছি।

কথা হচ্ছিল বাঁকুড়া জেলার সোনামুখি ব্লকের ছোট এক অখ্যাত জায়গা পাঁচালের এক চায়ের দোকানে। ইংরেজ আমলে একের পর এক দুর্ভিক্ষের কারণে বহু গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। খাদ্যের অভাবে, অবহেলায় মানুষ ছাড়া বহু গৃহপালিত প্রাণীও মারা যায়। যদিও দুর্ভিক্ষে মানুষের মৃত্যুর কথাই বলা হয়। একথা মেনে নেওয়া স্বাভাবিক খাদ্যের উৎপাদনের অভাবের জন্যই দুর্ভিক্ষ হয়। বাজারে খাবারের যোগান কম হয়। যদি এমনটা হয় খাবার মজুত আছে কিন্তু এক শ্রেণির মানুষ গোডাউন থেকে বাজারে তা বের করতে দিচ্ছে না বা প্রশাসনই চাইছে না। কিংবা বাজারে খাবার কিন্তু দাম বেশী। সাধারণ মানুষের কিনে খাওয়ার আর্থিক ক্ষমতা নেই। তাহলে মানুষ তা খেতে না পেয়ে মারা যাবে। যাদের কিনে খাওয়ার ক্ষমতা আছে তারা বেঁচে যাবেন। ঠিক এই ঘটনায় পৃথিবীর সব দুর্ভিক্ষের সময় ঘটেছে। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন প্রমাণ করে দিয়েছেন পৃথিবীর কোনো দুর্ভিক্ষই খাদ্যের অভাবের জন্য হয় নি এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গো খেতে পাওয়ার সম্পর্ক সরল রৈখিক নয়। উৎপাদন বাড়লেই সবাই যে খেতে পাবে এমন নিশ্চয়তা নেই। আফ্রিকার দেশসমুহ ও ভারতের কথা নয় বাদই দেওয়া গেল। মনে করুন কয়েক বছর আগে বাজারে পিয়াঁজের দাম ৭০-৮০ টাকা কেজি হলেও বাজারে পিয়াঁজের অভাব ছিল না। ১৯৪৩ এর (বাংলায় ১৩৫০ সাল) দুর্ভিক্ষেই তাই ঘটেছিল। ৬ টাকা মনের চাল ৬০ টাকায় দাড়িয়েছিল। বাজারে চালের অভাব ছিল না। ওই বছর উৎপাদনও বেশি হয়েছিল। ইংরেজরা অপপ্রচার করেছিল ধানের বাদামি দাগ রোগের (খুব কম ক্ষতিকারক একটি রোগ) জন্য চালের উৎপাদন কম হয়েছিল। তাছাড়া যুদ্ধের দামামায় সৈন্যদের জন্য খাবার যোগান নিশ্চিত করা বেশি জুরুরি ছিল। আর প্রজাদের জন্য কল্যাণকর ভূমিকা নেওয়ার জন্য ইংরেজদের কোনো দায় ছিল না। উল্লেখ্য দুর্ভিক্ষ্ কিন্তু বাংলার সব জেলাতে হয় নি এবং যে সমস্ত মানুষ জঙ্গাল নির্ভর জীবন যাপন করতেন ও চাষ না করা খাদ্য ও ফল মূল খেয়ে জীবন কাটাতেন তাঁদের গায়ে দুর্ভিক্ষের আঁচ লাগেনি। এখনো ভারতে প্রচুর খাদ্য উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও প্রায় ৪০ কোটি মানুষ ২ বেলা খেতে পাচ্ছেন না। ইদানীং চালু হচ্ছে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশন যার আওতায় প্রচুর মানুষকে নামমাত্র মূল্যে চাল গম সরবরাহ করা হবে। ভালো উদ্যোগ ঠিকই কিন্তু সবাই যদি নামমাত্র মূল্যে খাবার পেয়ে যান তা হলে কষ্ট করে চাষ করার ইচ্ছে থাকবে কিনা এনিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আসলে কিনে খাওয়ার ক্ষমতা আর রাষ্ট্রের গণ বন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে সবার জন্য খাদ্য সম্ভব হয়। পাঁচালের ওই চায়ের দোকানে খাবার নিয়ে কীভাবে রাজনীতির হয় সেই কথা বলতে হয়েছিল। ধরুন যদি একজন রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশের মত সুখা প্রদেশের কেউ যদি আক্ষেপ করে বলেন ওই সময় মাইলো, জোয়ার রাগীর বড়ই অভাব ছিল, ভাত খেয়ে দিন কাটত। তাহলে কেমন হত। আসলে খাদ্যাভাস সহজে

পরিবর্তন করা যায় না। সময় লাগে। খাদ্যাভাস গড়ে উঠেছে অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর উপর ভিত্তি করে।

সবুজ বিপ্লব

১৯৬৫-৬৬ সালে বিশেষ করে পূর্ব ও উত্তর ভারতে খাবারের ঘাটতি দেখা দেয়। খাবারের ঘাটতি একদিনে দেখা দেয় নি। ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উপর জোর কমতে থাকে বিশেষ করে সেচ ব্যবস্থার। ধীরে ধীরে খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। মার্কিন পি এল ৪৮০ (মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির এক সংশোধনী 'পাবলিক ল-৪৮০') এর নিয়মাবলী অনুযায়ী ভারতে সবুজ বিপ্লব চুক্তিতে সই করার আবেদন জানান। লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মহাশয় সবুজ বিপ্লব চুক্তিতে সই করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি আশাবাদী ছিলেন বিদেশি প্রযুক্তি ছাড়াই ভারতীয় কৃষি বিজ্ঞানীরাই খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। ঘটনা চক্রে তাঁর মৃত্যুর পরই আমেরিকার সঙ্গো সবুজ বিপ্লব চুক্তিতে সই করে। লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর সমালোচনা আমেরিকান নীতি নির্ধারকরা ভালো চোখে নেয় নি। পরে পি এল ৪৮০ এর বরাদ্দ খাদ্য সরবরাহ কমিয়ে দেয়। আবার তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দেয়। ভারত সবুজ বিপ্লব চুক্তিতে সই করবে এই শর্তে আমেরিকান পররাষ্ট্র দপ্তর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে। পরে সেই অসম্মানজনক চুক্তিতে সই হল। অন্যদিকে সবুজ বিপ্লবের জন্য প্রচুর প্রচার চালানো হয়। কে আর ভাববে এর খারাপ কিছু হতে পারে! ধরে নেওয়া হল এত ভালো উন্নয়নের মডেল আর হতে পারে না। দুর্ভিক্ষের ভয়, দ্রুত খাদ্য উৎপাদন , শহরে খাবার যোগান নিশ্চিত করা ও গোডাউনে খাদ্য মজুত করবার জন্য মার্কিন প্রযুক্তি নির্ভর নতুন এক কৃষি ব্যবস্থা নিয়ে আসা হল। সবুজ বিপ্লব ব্যবস্থায় কৃষির সব উপকরণ বাইরের থেকে কিনতে হবে। সবুজ বিপ্লবে শেখানো হল সব দেশি বীজের উৎপাদনশীলতা কম তাই এমন ম্যাজিক উচ্চফলন বীজের ব্যবহার করতে হবে। হাজার হাজার বছরের বংশানুক্রমিক পরীক্ষিত কৃষি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বদলে এল ম্যাজিক বীজ, রাসায়নিক সার ও বিষ। বাজার থেকে তা কিনতে হবে। তিন বছর অন্তর অন্তর বীজ পাল্টাতে হবে সেই সঙ্গো লাগবে বেশি করে রাসায়নিক সার ও বিষ। এই কৃষি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়ে সহজ ও পরিবেশ ও কৃষক বান্ধব দেশি ধানের সপক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন কটকে অবস্থিত কেন্দ্রীয় ধান গবেষণা কেন্দ্রের অধিকর্তা ড. আর এইচ রিছারিয়া। বেঁটে জাতের জ্যাপানিকা ধান থেকে এদেশের ইন্ডিকা ধানে রোগ ছড়িয়ে পড়া নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন কেন্দ্রীয় ধান গবেষণা কেন্দ্রই বেশি ফলনের ধানের জাত তৈরি করতে সক্ষম। এতে খরচও কম হবে। বিনিময়ে জুটেছিল লাঞ্ছনা, অপবাদ ও চাকুরি থেকে বরখাস্ত হওয়া। অথচ তার গবেষণা নিয়ে পুর্নমূল্যায়নের কথা বল হয় না পাছে সত্যিটা উদঘাটিত হয়ে যায়। তার নির্বাচিত বীজ নিয়ে কৃষকের জমিতে পরীক্ষা নিরীক্ষাও হল না।

সবুজ বিপ্লোত্তর অবস্থা

দেশজ ফসলের কোন মূল্যায়ন না করেই আমরা পাশ্চাত্য প্রযুক্তি অন্ধের মত অনুসরন করলাম। চাষের সব প্রাকৃতিক ও সহজ লভ্য উপাদানকে উপেক্ষা করে কৃষি উপকরণকে বাজার নির্ভর করা হল। প্রচার চলল সব পাশ্চাত্য কৃষি ব্যবস্থাই ভালো। ধীরে ধীরে সার বিষ ও বীজ কোম্পানির স্লোগার নীতি নির্ধারকদেরও স্লোগানে পরিণত হল। ভারতের মত জৈব সম্পদে সমৃদ্ধশালী দেশেও দেশজ ফসলকে কোনো গুরুত্ব না দিয়ে পুঁজি নির্ভর বীজ, রাসায়নিক সার ও বিষের প্রবল প্রচার চালানো হয়। এটাই হল মূল প্রাতিষ্ঠানিক স্রোত।

সেই ভাবে মার্কিন সাহায্যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠল। প্রায় ৩০০০ এর বেশি কৃষি ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও বিজ্ঞানীদের সবুজ বিপ্লবের প্রচারের জন্য মার্কিন মূলকে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়। মার্কিন কৃষির ধাঁচে পঠন পাঠন শুরু হল। মার্কিন কৃষির পাঠ্যপুস্তক এখানে চালু হল। সেটাই হল উন্নয়নের মূল মন্ত্র। সেখানে উচ্চফলনশীল বীজ ও রাসায়নিকের প্রয়োগটাই বড় কথা। অনেকটা ধর্মীয় অন্ধতার মত। ধরে নেওয়া হল এটাই মূল মন্ত্র। সেখানে উচ্চফলন বীজ ও রাসায়নিকের প্রয়োগটাই বড় কথা। অনেকটা ধর্মীয় অন্ধতার মত। ধরে নেওয়া হয় এটাই একমাত্র ব্যবস্থা, এর বাইরে যেন কোন বিকল্প ব্যবস্থা থাকতেই পারে না। থাকলেও তা বলা চলবে না বলা যাবে না। যারা ওই ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন তুলছিলনে তাঁদেরকে পাত্তা দেওয়া হয়নি। প্রচারের জৌলুস ও দাপটে উত্থাপিত প্রশ্ন ঢাকা পড়ে যায়। কিন্তু তার মূল্য এখন আমাদের সবাইকে দিতে হচ্ছে। দ্রুত ফলন বৃদ্ধির জন্য সবুজ বিপ্লবের জয়গান এমনভাবে চালানো হল যাতে সবাই ধরে নেয় এই বিপ্লব না হলে মানুষ খেতে পেত না। নৈতিকতা হার মানল কৃষি রাসায়নিক ও বাজারি বীজের বাণিজ্যের কাছে। ওই বিপ্লবের প্রায় ৫০ (১৯৬৮- ২০১৮) বছর পরে আমাদের চাওয়া পাওয়ার হিসেবটা করা যেতে পারে। প্রথম দিকে ম্যাজিক বীজ ও সেচের দৌলতে প্রভূত ফলন বেড়েছিল। জঞ্জাল কেটে আবাদি জমি করা হয়েছিল। পাঞ্জাবে গম বিপ্লবের (সবুজ বিপ্লব) সাফল্য পাওয়ার অন্যতম কারণ ছিল ভালো বাজার ব্যবস্থাপনা। সেই বাজার ব্যবস্থাপনা সর্বত্র গড়ে উঠে নি, ইদানিং কিছু কিছু উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

পূর্ব ভারতে ধান বিপ্লব

টিএন ১ (তাইচুং নেটিভ), আই আর ৮ (ইন্টারন্যাশনাল রাইস ৮), জয়া ইত্যাদি বাজারে আসে। ভর্তুকি ছাড়াও বাজারে বিক্রি হতে শুরু করল। বীজের বাজার তৈরি হল। চাষীদের নিজেদের মধ্যে বীজ বিনিময়ের পরিবর্তে বীজ পণ্যে পরিণত হল। বাজারে একটার পর একটা নতুন বীজ আসে। প্রচার প্রাবল্যে ম্যাজিক বীজের বিক্রিও বাড়তে শুরু করে। ওই ধান গাছ বেঁটে হয়, রাসায়নিক সার সহ্য করতে পারে আর রোগ পোকাও বেশি লাগে। ১৯৮০ দশকের লালবর্ণ ধানের ফলন ছিল বিঘায় ২২ মন। এখন আগের থেকে প্রচুর সার ও কীটনাশক দিয়েও আগের মত ফলন পাওয়া যায় না। গড় ফলন ১৫ মন। এই রকমভাবে অনেক আধুনিক জাতের চাষ প্রথম দিকে বাড়লেও তা বন্ধ হয়ে যায়, আবার নতুন বীজ আসে। এদিকে চাষের খরচ বাড়ছে। মাটি, জল, খাবার-দুধ, মাছ, মাংস, ডিম ও ফল সব কিছুতেই বিষের অবশেষ পাওয়া যাচ্ছে। বোরো ধান চাষের জন্য মাটির তলার জল অতিরিক্ত তোলার জন্য পশ্চিমবঙ্গের ১২৫টির বেশি ব্লকের জলে এখন মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে।

ডাল শস্যের এলাকা ব্যাপক ভাবে কমে গিয়েছে। ডালের ঘাটতি দেখা দিয়েছে অথচ চালের বাড় বাড়ন্ত। খেসারীর ডাল খেলে স্নায়ুর অসুখ হবে এমন অতিরঞ্জিত প্রচারে খেসারীর চাষ উঠে গেল। আসলে আমন ধান কাটার কয়েকদিন আগে খেসারীর বীজ ছিটিয়ে দেওয়া হত। ধান কাটার পর খেসারী বড় হত, শাক খাওয়া হত। ৩-৪ মাসে বিনা খরচায় প্রায় বিঘায় ১০০ কেজি ডাল উৎপাদন হত সার ও বিষ ও ভূমি কর্ষণ ছাড়াই। শিকড়ের নাইট্রোজেন সংগ্রহকারী রাইজোবিয়াম অর্বুদের থেকে পাওয়া নাইট্রোজেন দ্বারা জমিও উর্বর হত। সেখানে সার, বিষ, কেনা বীজ ও পাম্প সেট সহযোগে বোরো ধানের চাষ শুরু হল। ওই ডাল ক্রমাগত প্রতিদিন খেলে ও অপুষ্টির কারণে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ঘটনা ঘটতে পারে। সেটা

অতিসরলীকরণের মত চাষ না হওয়া বা বন্ধ করার কোনো হতে পারে না। অনেক বয়স্ক চিকিৎসক ওই রোগের কথা বইয়ে পড়লেও জীবনে ওই রোগী দেখেন নি। ইদানিং আবার ভুল বিভ্রান্তি ও অপপর্চার নিয়ে পুর্নমূল্যায়ন হচ্ছে। খেসারী চাষের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ডাল আমাদের বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়।

সবুজ বিপ্লবের লীলাক্ষেত্র পাঞ্জাবের অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে। কৃষি বিপ্লব ও উন্নয়নের নামে সার ও কীটনাশক ব্যাপক ব্যবহার অনেক আগেই শুরু হয়েছে। গোটা ভারতের বেশ কিছু রাজ্যের মত এখানেও কৃষক আত্যহত্যার মত ঘটনা ঘটছে। মোট ঋণের পরিমাণ প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকা। ভারতে মিউচুয়াল ফাণ্ডে বিনিয়োগের সম পরিমাণ। গড় পড়তা প্রান্তিক চাষীর ঋণের পরিমাণ হল ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা আর একর প্রতি ঋণের পরিমাণ ৫০ হাজার ২১১ টাকা (Rs 69,355 core debt: Thats killing Punjab farmers, টাইমস অফ ইণ্ডিয়া ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬)। ভাতিন্দা জেলার তুলো চাষে ব্যাপক কীটনাশক ব্যবহার হয় সঙ্গো রাসায়নিক সার। জলে ফ্লোরাইড পাওয়া যাচ্ছে। ভাতিন্দা জেলার ক্যানসার আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেদনাদায়ক। ওখান থেকে বিকানীর গামী এক্সপ্রেস ট্রেনে বেশির ভাগ যাত্রীরাই ক্যানসার রোগী। তাই ট্রেনের নাম বদলে গিয়ে স্থানীয় ভাবে বলা হয় ক্যানসার এক্সপ্রেস। বিশ্ব বাণিজ্য চুক্তি হওয়ার পর কৃষকের উপর অনেক ক্ষতিকারক ও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। কৃষক আত্মহত্যা, চাষের খরচ বৃদ্ধি, নায্য দাম না পাওয়া, রোগ ভোগ বাড়া, সেচের অভাব, খরা ও ঋণ ইত্যাদি নিয়ে কৃষকরা জেরবার। এই সব দাবী দাওয়া নিয়ে মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে ৬ দিন পায়ে হেঁটে মুম্বাইএ পদযাত্রা করে আসেন প্রায় ৪০০০০ কৃষক। সাম্প্রতিককালের মধ্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

সবুজ বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল সব মানুষকে খাওয়ানো। অনেক মানুষকে খাওয়ানো সম্ভব হলেও সবাইকে খাওয়ানো সম্ভব হয় নি। সরকারি তথ্য অনুযায়ী ৩৭ কোটি মানুষ দুবেলা খাবার জোগাড় করতে পারেন না। ক্ষুধা সূচকে ভারতের স্থানও অনেক নীচে। কারণটা আগেই উল্লেখ করেছি। অবশ্য আমেরিকাতেও প্রচুর খাবার উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও প্রায় ২ কোটি বেশি মানুষের খাবারের নিশ্চয়তা নেই।

উচ্চ ফলনশীল ধানের তাৎক্ষণিক চমক ও ফলনের ম্যাজিকে দেশি ধান বিগত ৩০ বছরেই ৯৫শতাংশ লোপ পেয়ে গেল। সেই সঙ্গো রাসায়নিক কৃষির প্রচার প্রাবল্যে অন্যান্য দেশজ ফসল, কম খরচের চাষাবাদ, দেশজ প্রযুক্তিগত জ্ঞান সবই কুসংস্কারে পরিণত হল। অবজ্ঞা ও অবহেলার বিষয়। পুস্তকে ডোডো পাখির হারিয়ে যাওয়া নিয়ে আপেক্ষের কথা শোনা যায় অথচ দেশের হাজার হাজার ফসলের জাত হারিয়ে যাওয়া নিয়ে কারুর কোনো মাথাব্যাথা নেই।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও ২য় সবুজ বিপ্লব

মুক্ত বাণিজ্য ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সৌজন্যে জীবিত দ্রব্যের ওপর পেটেন্ট নেওয়ার হিড়িক পড়েছে। তৃতীয় বিশ্বের জৈব সম্পদের মার্কিন বহুজাতিক সংস্থার শ্যেন দৃষ্টি পড়েছে। বাসমতি ধান, নীম, কাঁঠাল, করলা, বাঁদরলাঠি, সরিষা ইত্যাদির পেটেন্ট এখন ভারতের হাতে নেই। অথচ ভারত এখনো পর্যন্ত বিদেশের কোন উদ্ভিদের পেটেন্ট নিতে পারেনি।

অন্য দিকে ঠিক এর বিপরীতে সবুজ বিপ্লবের বিপদ ও বহুল সমস্যার নিরসন না করেই আরো এক মার্কিন ব্যবসায়িক নীতি দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের নামে পূর্ব ভারতের রাজ্য গুলিতে চালু করা হচ্ছে। কারণ মাটির

জল এখানে পাঞ্জাবের মত নিঃশ্বেষ হয়ে যায় নি। তাই বহুল ভাবে ভর্তুকি যুক্ত পাম্প সেট, হাইব্রিড ধান ও রাসায়নিক সার ও বিষের ঢালাও ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিটি তুলো ছাড়া খাদ্য ফসলে জিন শস্য চালুর চেষ্টা প্রবল রয়েছে। বিটি বেগুন, জিএম সরিষা ও ধানের পরীক্ষা মূলক ট্রায়াল বিজ্ঞান আন্দোলনের চাপে আপাতত স্থগিত রাখা আছে। ২০১৬ ফেব্রুয়ারি মাসে জিএম সরিষা ট্রায়াল আপাতত স্থগিত রাখা আছে। ২০০৫ সালে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের কৃষিজ্ঞান চুক্তির ফলে ওদের দেশের বহুজাতিক কোম্পানির বাণিজ্যিক স্বার্থ ভারতবাসীকে দেখতে হবে, এতে ভারতীয় কৃষকদের ক্ষতি হলে হবে। বহুজাতিক কোম্পানির অর্থানুকূল্যে ভারতের ৫০টার বেশি প্রতিষ্ঠান জিন শস্যের গবেষণায় লিপ্ত। পরিবেশ বান্ধব কম খরচের চাষকে অগ্রাহ্য করে তারা এই বির্তকিত ফসলের প্রচার করবেন স্বাভাবিক কারণে। ভারতীয় জনগণের ও কৃষক স্বার্থ বিরোধী আরো একটি বিষয় হল খুচরো পণ্যে ৫১ শতাংশ বিদেশি লগ্নি। এতে ওয়ালমার্ট সহ কিছু কোম্পানির প্রভূত মুনাফা হবে, আর মুষ্টিমেয় ভারতবাসীর কিছু সুবিধা হবে। এনিয়ে ডিসেম্বর ২০১২ তে ভারতীয় সংসদে এক অচলাবস্তা তৈরি হয়, বেশির ভাগ (১৪টি দল) রাজনৈতিক দলে এর বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়ে মতামত দিয়ে ছিলেন। একটি দলের বেশি সাংসদ থাকার জন্য বেশি ভোট পায়। পক্ষে ২টি দল। ১৯৯০-৯১ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের সঙ্গে ভারতের স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রামের চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এটা দেশের জনগণের প্রতি রাষ্ট্রের কল্যাণকর ব্যবস্থাপনাকে আস্তে আস্তে খর্ব করার হাতিয়ার। জলে, শিক্ষায়, চিকিৎসায় সর্বত্র কর চাপাতে হবে, কম খরচের চিকিৎসা চলবে না, চিকিৎসা সেবা নয় ব্যবসায় পরিণত করতে হবে, কর্পোরেট চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। বিনা পয়সায় কিছু হবার নয়। ফেল কড়ি মাখ তেল। রাষ্ট্র বাজার নিয়ন্ত্রণ করবে না, দেশের বাজারকে বিদেশিদের জন্য পুরো খুলে দিতে হবে। এসব না করলে নাকি ভারত বৈদেশিক ঋণ শোধ করতে পারবে না।

আমাদের ফসল বৈচিত্র্য

ভারতবর্ষ জৈব সম্পদে সমৃদ্ধশালী দেশ। ব্রাজিল, আফ্রিকা মহাদেশের বহু দেশও বিপুল ফসল বৈচিত্রের দেশ। যে দেশে যত ফসল বৈচিত্র্য সেই দেশে খাবারের অভাব কম অনুভূত হবে। দক্ষিণ ভারতে বহুবার পর্যটনের নাম করে বিদেশিরা মশলা লুঠ করে। এর মধ্যে পুর্তগিজ জলদস্যু ভাস্কো দা গামা উল্লেখযোগ্য। শুধু মশলা নয়, অনান্য ফসলের প্রভুত বৈচিত্র্য ছইল। নীচের সারনিটি দেখলেই বোঝা যাবে। বিশ্ব বাণিজ্য চুক্তির পর বহুজাতিক সংস্থারা প্রাণ সম্পদের পেটেন্ট নেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ভারতের উপর শ্যেন দৃষ্টি রয়েছে।

....পরবর্তী অংশ পরের সংখ্যায়।

আর্থসমাজ জীবনে মুসলিমদের পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ কাল পাত্র ক্ষেত্রিক ইতিহাস সৃষ্টি না করা

'অস্তিত্ব': বিশ্লেষণ ও সম্পাদনা - ইমদাদুল হক

সাচার কমিটির রিপোর্টে বাম আন্দোলনে ধাক্কা

২০০৬ সালের নভেম্বরে সাচার কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেছিল তাতে ভারতবর্ষের মুসলিমদের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিসংখ্যান ছিল মাত্র। মুসলিমদের পিছিয়ে পড়ার কারণ সেই রিপোর্টে উল্লেখ ছিল না। সেই রিপোর্ট প্রকাশের পর ভারতবর্ষে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী আন্দোলন বিশাল ধাক্কা খায়। ২৯ বছর বামফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকা পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমরা সবথেকে পিছিয়ে ছিল। সেই কারণে বাম নেতৃত্বকে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যেও কৈফিয়ত দিতে হয়েছে। মুসলিমরা কেন পিছিয়ে তার সঠিক ব্যাখ্যা বাম নেতৃত্ব বোঝাতে সক্ষম হয়নি, তাই সারা দেশেই বাম আন্দোলন ধাক্কা খেয়েছে। যদিও মুক্তবাজার অর্থনীতিতে ১৯৯১ সাল থেকেই পরগাছামির দাপট বেড়েছে। এখন প্রশ্ন হল, শুধু কি ভারতবর্ষ, পৃথিবীর সব জনপদের মুসলিমরা পিছিয়ে কেন?

উপনিবেশ, নয়া উপনিবেশ ও মুক্তবাজার অর্থনীতি

রক্ষণকামিতা যখন ইউরোপ তথা গোটা পাশ্চাত্যে চরম রক্ত পিপাসু হয়ে উঠল, তখন সেই রক্ত পিপাসা নিরসন করতে উপনিবেশ তৈরিতে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদে ভৌগোলিক আগ্রাসন করেছে। তাদের উপনিবেশগুলো থেকে সম্পদ শোষণ করে তারা তাদের জনপদে নিয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশরা নিজেদের আড়াল করল, তারা ধরাও পড়ল না, মানবতার শত্রু রূপে চিহ্নিতও হল না। সামনে চলে এলো পড়ে পাওয়া চোদ্দআনার দাম্ভিকতার নীতি আদর্শহীন দম্ভ। উপনিবেশের রূপটা হল বিশ্বায়নের নামে নয়া উপনিবেশ, যার ভিত্তি মুক্তবাজার অর্থনীতি। আবার মুক্তবাজার অর্থনীতি গণতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকও বটে। তাতে শোষণের জন্য ভৌগোলিক আগ্রাসনের দরকার হয় না। অর্থনৈতিক আগ্রাসনে অনেক দূর থেকে হাতির শুঁড় দিয়ে মুক্তবাজার থেকে সম্পদ শোষণ করে শাসন চালিয়ে যেতে পারে। এই গণেশী অর্থনীতি মানে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সকল সম্প্রদায় শোষিত হয়। গণেশী অর্থনীতির জন্য কোনো দর্শন বা নীতি আদর্শের দরকার হয় না। শ্রমের মূল্যায়নেরও দরকার নেই, শ্রমমূল্যের বিভাজনেরও দরকার নেই, যে যত পারবে কুক্ষি করবে, সম্পদকে ধনার্বজনায় সংক্রামিত করে গলা গলা ডুবে যাবে। সেই কুক্ষির মাথায় ভর দিয়েই সেই আবর্জনীরা কখন কুরুক্ষেত্রে হাজির হয়ে যায় তা একটুও টের পায় না! জন্মান্ধ-আর্থসমাজ সংক্রামিত সংখ্যাধিক্যের রোগে ভোগে তো! তার মানে কি জন্মান্ধ দাপটের কবলে মানবতাকে সঁপে দেওয়া যায়? না, অবশ্যই না। তাতে তা সঁপে দেওয়া যায় না বলেই চক্ষুষ্মান পাণ্ডবের জন্ম দিতে হয়। অন্ধত্বভেদী এই চক্ষুষ্মান পাণ্ডবের জন্ম দেওয়াই দর্শন চর্চা।

দর্শন ও পরিকল্পিত অর্থনীতি

ভারতীয় দর্শনঃ পরিকল্পিত বা নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির জন্যই দর্শনের প্রয়োজন হয়। শ্রমমূল্যের বাস্তবানুগ প্রয়োগেই আর্থসমাজ-জীবন হয় পরিশীলিত। এই শ্রমমূল্যের দুটি ভাগ — আবশ্যিক মূল্য ও উদবৃত্ত মূল্য। এই উদবৃত্ত মূল্য ব্যক্তিকুক্ষি হলে তা হয় ধন। ধন ব্যক্তিকুক্ষিতে থাকা মানে মায়ের বাড়িতে থাকা। সেই সমাজের বিকাশের জন্য এই ধনকে সম্যক (সম) রূপে

মানে সেই সমাজ রূপকার্থ মাসির বাড়ি পর্যন্ত বিকেন্দ্রিকরণ করতে হয়। যে বিকেন্দ্রিকরণে সেই ধন রূপান্তরিত হয় সম্পদে (সম+পদ)। সম্পদ মানে আর্থসামাজিক ফান্ড, যা সেই সমাজের সকলের ভোগ্য। রাজনীতির কাজ সেই সম্পদের বিন্যাসে মেধা-মানবতা বিকাশী উন্নয়নে সমশ্লবান শ্রমক্ষেত্র তৈরি করা। যাতে শ্রমক্ষেত্রের অভাব কবলিত সেই সমাজে এক ইউনিট শ্রমশক্তিও নষ্ট না হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় সেই সমাজে সকলেই শান্তি ভোগ করে। শান্তি ভোগ বাচক সেই সমাজই হয় রথ রূপ চলন্তিকা। এটিই ধনকে আর্থসামাজিক ফান্ডে রূপান্তর করা মায়ের বাড়ি থেকে মাসির বাড়ি ভ্রমণ করা জগন্নাথী রথযাত্রার তাত্ত্বিকার্থ। চলন্ত সেই সমাজের উন্নয়ন প্রত্যেকের ঘরে ঘরে ফিরে আসে। যা প্রতীকী মাসির বাড়ি থেকে মায়ের বাড়ি ফেরা উল্টো রথ যাত্রা। চলমান সমাজে সকলেই শান্তি ভোগ করে।

অর্থাৎ শ্রমমূল্যের ব্যক্তিকুক্ষি বিশেষিত ধন কখনই সেই সমাজ বিকাশে সহযোগী হয় না, তাই তা ধনের আবর্জনা। দুঃ অর্থে খারাপ। অর্থাৎ সেই আবর্জনা রূপ ধনই দুর্যোধন। যেহেতু সৃষ্টিগতভাবে মানুষ চেতনার অতলতলী, সেহেতু শ্রমমূল্যকে সে ব্যক্তিকুক্ষিই করতে চায়। তাই ব্যক্তিকুক্ষির ধনকে আর্থসামাজিক ট্রাস্টে অর্পণের জন্য তাকে জাকাত প্রযৌক্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। সেই যোগ্যতা অর্জন করতে পারলেই একাগ্রতা নিয়ে তার আমিত্বিক ধ্রুব লক্ষ্যে স্থির থাকে। যে একাগ্রতার আমিত্ব সংগ্রাম করেই সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে হয়। অর্থাৎ যোগ্যতা অর্জন বাচক অর্জুন হতে পারলে, উত্তরণী সংগ্রামের স্থিরতায় যুধিষ্ঠিরের সহযোগী হয়ে দুর্যোধনকে হারিয়ে 'শ্রী' বাচক যোগ্যতম বাস্তবতায় আর্থসামাজিক স্বর্গ রচনা করা যায়। যা পাণ্ডবদের সশরীরে স্বর্গারোহণ। যে স্বর্গে দুর্যোধন সহ কৌরবরাও থাকে, কারণ দুর্যোধন তখন ব্যক্তিকুক্ষির ধন নয়, তা তখন সেই সমাজের বিকাশেয় লক্ষ্মীর ভাঁড় যা সকলের ভোগ্য সম্পদ। তাই নেতৃত্বকে হতে হয় ধর্মরাজ। অর্থাৎ যিনি ধর্মের নেতা, তিনিই রাজনীতির নেতা। ধর্ম ব্যক্তিকুক্ষির ধনকে আর্থসামাজিক ট্রাস্টে অর্পণ করতে সহযোগী হয় আর তত্ত্বাবধানী রাজনীতি সেই ফান্ডের বিন্যাসে প্রকল্প রচনা করে সেই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। সন্তান্দরপুরি পুরাণের সেই পূর্ণত্বই মহাভারত। পুরাণ চিরায়ত তত্ত্ব। অর্থাৎ দর্শন তত্ত্বের ফলিত প্রয়োগের কৃৎকলাই রাজনীতি আর অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে রাজনৈতিক প্রয়োগটিই ধর্ম।

ইসলামঃ দর্শন আর্থসামাজিক বিকাশে শোষণ নিপীড়ন থেকে সেই সমাজ মুক্তির পথ দেখায়। উৎপাদনী শ্রম, শ্রমের মূল্যায়ন, মূল্যের বিভাজন ও পরিকল্পিত অর্থনীতি প্রযৌক্তিক উদবৃত্ত মূল্য (জাকাত) বিন্যাসনী তন্ত্রই ইসলাম। জাকাত প্রযুক্তির বাস্তবায়ন দুইভাবে —প্রথমটি সেই এলাকায় আর দ্বিতীয়টি হজ্বের বিশ্ব সমাবেশে। হজ্ব — বিশ্ব মানবতার আর্থসমাজ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এবং সমগ্র বিশ্ব থেকে জাকাত এবং হজ্বের জমায়েতে কোরবানিসহ যে অর্থ সংগৃহীত হয়, সেই সংগৃহীত মূল্যের বিকেন্দ্রিকরণ। অর্থাৎ মেধা-মানবতার বিকাশের জন্য বিভিন্ন জনপদকে তার ঘাটতি সম্পূরক অর্থ দেওয়া। সেই অর্থে শ্রমক্ষেত্র তৈরি হয়, শ্রমশক্তি নষ্ট হয় না, বেকারত্ব থাকে না, মেধার বিকাশ ঘটে। ৬৩০-এ মক্কা বিজয়ের পর ইসলামের আর্থসামাজিক প্রযুক্তি প্রয়োগে তৈরি হয়েছিল বৃন্দাবনী আর্থসমাজ, যা স্টেটলেস সোসাইটির অনুপ্রেরণা। এই প্রযুক্তি প্রয়োগেই মেধা-মানবতার বিকাশ ঘটেছিল বলেই আরব জনপদগুলোয় দীর্ঘদিন ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হয়েছে। কিন্তু মোয়াবিয়ার হাতে যে শাসন পদ্ধতির প্রচলন হয়েছে, তাতে তা উবেও গেছে।

ঐতিহাসিক ইসলামের পিরিয়ডে পর পর তিন খলিফা (শাসন তত্ত্বাবধানী প্রতিনিধিত্ব) হত্যা হওয়ার পর ৬৬১তে স্বঘোষিত খলিফা মোয়াবিয়া পৈতৃক ক্ষমতার বিষ বীজ পুঁতল। কারবালার পৈশাচিক দুর্ঘটনায় দুর্মতি মোয়াবিয়া আর ইয়াজিদ সেই পৈতৃক পুনর্ক্ষমতারীতির বিষবৃক্ষ পাকাপাকিভাবে গভীরতায় শিকড় বসাল। যুগপ্রজ্ঞার অভাবে ইসলামের ঐতিহাসিক অতীত-আরব কেন্দ্রিক চেতনা সেই বিষ বৃক্ষের শিকড় উপড়ে ফেলতে পারেনি। উদবৃত্ত মূল্য বিন্যাসনী প্রকৃষ্টতম রাজনৈতিক কৃৎকলার শ্বাশত ইসলাম মোয়াবিয়া ইয়াজিদের হাতে অকেজো হয়ে গেল। ইসলামের আর্থসামাজিক প্রযুক্তি অকেজো করে হজ্বের অর্থও হয়ে গেল পৈতৃক ক্ষমতায় কুক্ষি।

কমিউনিজমঃ ইসলামের আর্থসামাজিক প্রযুক্তি অকেজো হওয়ার দীর্ঘ হাজার বছর পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপিয় শিল্প বিপ্লবের ফলে যে উদবৃত্ত মূল্যের উৎপাদন হয়েছিল তার বাস্তবানুগ প্রয়োগের জন্য আয়াস সাপেক্ষ পশ্চিমা জীবন আর্থসামাজিক মূল্যের হিসেব কষেছে। আর এইভাবেই হিসেব কষতে কষতে এগিয়েছেন হেগেল, লুদভিখ ফয়েরবাখ, প্রুঁধো প্রমুখ। আর তাঁদের সূত্র ধরেই মার্কস-এঞ্জেলস শ্রম তথা উদবৃত্ত মূল্যের কানাগলিটা পেয়ে গেছেন। নৈর্ব্যক্তিতার অবস্থান থেকে ঐতিহাসিক মানব চরিত্র কার্ল মার্কস বিশ্লেষণ করেছেন শ্রম মূল্যায়নগত মনের আর্থসমাজ সম্পর্কের রুট। লেনিনের মতো প্রযোক্তার হাতে মার্কসিয় দর্শনের রাজনৈতিক প্রয়োগে নন্দনকাননের সূচনায় সোভিয়েত গঠন হয়েছিল। আত্মপ্রতারণী পৈতৃক ক্ষমতার হাতে অকেজো হয়ে যাওয়া ইসলামের মৌচাক তত্ত্ব প্রযুক্তি ঐতিহাসিক কমিউনিজমের হাতে হাত মেলানো অভিযোজনার বাস্তবতায় মানুষ দীর্ঘায়িত বস্তুত্বের ভোগ সন্ধান পেল ও শান্তিভোগ করল। অতঃপর ২০/১২/১৯৯১-তে ক্রেমলিন থেকে নেমে গেল শ্রমিকের ধ্রুবলক্ষ্য প্রতীক লালঝাণ্ডা, কমিউনিজমের আর্থসামাজিক প্রযুক্তিও অকেজো করে দিল। দর্শন বিযুক্ত আর্থসমাজে অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ হীনতায় মুক্তবাজার অর্থনীতিতে মানুষ হয়ে গেল দিশেহারা।

অর্থনৈতিকভাবে ভারতের মুসলিম ও ভারতবর্ষের পিছিয়ে পড়ার কারণ

২০১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গা থেকে ১১৬৫২ এবং ভারতবর্ষ থেকে ১৭৫০২৫ জন হজ্বে গিয়েছেন। হজ্বে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমরা প্রায় ৪০০ কোটি টাকা এবং ভারতবর্ষ থেকে ৫৫০০ থেকে ৬০০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। উমরাহতেও কোটি কোটি টাকা খরচ করে। হিসাব কষলে দেখা যাবে শুধু ২০১৮ সালে ৮০০০ থেকে ১০০০০ কোটি টাকা ভারতের মুসলিমরা তাদের নিজস্ব সমাজ-বিকাশী-অর্থ খরচ করেছে দেশের বাইরে। তাতে তারা নিজেরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হল আর দেশের অর্থনীতিকেও দুর্বল করল। ২০১৮তেই এই পরিমাণ অর্থে ভারতে ২ থেকে ৩ লক্ষ মেধার কর্মসংস্থান হতে পারত। প্রতি বছর এইভাবে কর্মসংস্থান তৈরি হলে শুধু মুসলিম কেন, এই জনপদের ধর্মীয় সেন্টিমেন্টগত অন্যান্য সম্প্রদায়েরও একটি মেধা বেকার থাকত না। এই বিশাল পরিমাণ অর্থ মানবতা বিকাশে ফিরে না পাওয়াই এই জনপদের সকলেই উন্নয়ন থেকে পিছিয়ে পড়ল।

উল্টো রথ যাত্রা না হওয়ায় সেই সমাজ অচল হয়ে যায়, জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা হয় না। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হলে সেই সমাজ থেকে মেধা-মানবতা হারিয়ে যায়। সেখানে নানান উপসর্গের সংক্রমণ হতে থাকে। দর্শন প্রযুক্তি প্রয়োগ না হওয়ায় মুক্তবাজার অর্থনীতিতে উঞ্ছবৃত্তি, পরগাছামির প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। সেই সমাজ

থেকে ন্যায়-অন্যায়, হালাল-হারাম বোধ উবে যায়। অবাঞ্ছিত সেন্টিমেন্ট আর হঠকারিতার ইন্ধনে আত্মধ্বংসী কুহেলীতে ঢুকে মানুষ হয়ে যায় আতঙ্কবাদী, জেহাদি, তৈরি করে বিভিন্ন সেন্টিমেন্ট্যাল বাহিনী। অচল সমাজে সকলকে অশান্তি দুর্ভোগ করতে হয়।

হজ্বে অংশগ্রহণকারী জনপদগুলির পিছিয়ে পড়ার কারণ

নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি বাস্তবায়নে হজ্বের গুরুত্ব অপরিসীম। হজ্বে অংশগ্রহণকারী জনপদগুলির অর্থ জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তির আদান প্রদানে সেই জনপদগুলির বাউন্ডারি উঠে যায়, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধে সেই জনপদগুলি একসঙ্গে কাজ করে। জনপদগুলিতে শ্রমক্ষেত্র তৈরি হয়, শ্রমশক্তি নষ্ট হয় না, বেকারত্ব থাকে না, মেধা-মানবতা বিকাশে সূচনা হয় নন্দনকাননের।

কিন্তু হজ্বে অংশগ্রহণকারী সমস্ত জনপদ মেধা-মানবতার বিকাশের জন্য ঘাটতি সম্পূরক অর্থ না পাওয়ায় পিছিয়ে পড়েছে। ভি এস নইপল বলেছেন ইসলাম উপনিবেশ থেকেও মারাত্মক। কেননা প্রতি বছর হজ্বে প্রচুর পরিমাণ অর্থ সৌদি বাদশার কাছে কুক্ষি হয়ে যায়। হজ্বের অর্থ মেধা-মানবতার বিকাশনে ব্যবহৃত না হওয়ায় বিশ্বব্যাপী মুসলিমরা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। ইসলাম রাজনীতির কৃৎকলা অথচ মুসলিমরা রাজনৈতিকভাবে সচেতন নয়, বিশ্ব রাজনীতিতে মুসলিম জনপদগুলির কোনো ভূমিকা নেই। তারা ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে যে জনপদ থেকে যত বেশি সংখ্যায় হজ্বে যাবে, সেই জনপদ ততই আর্থিকভাবে দুর্বল হয়। এই জন্যই মুসলিম ট্র্যাডিশনাল জনপদগুলি অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে। একমাত্র ইরান জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় মাথা উঁচু করে আছে। ইরানকে ধ্বংস করার জন্য সৌদি আরব, ইজরায়েল ও আমেরিকা একজোট হয়ে আক্রমণ করছে। আশ্চর্যের বিষয়, প্রতিবছর হজ্বে অংশগ্রহণকারীর সংখা বাড়ছে, কিন্তু বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ উবে গিয়ে শত্রুতায় জনপদগুলি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে ধ্বংস হচ্ছে, তা নিয়ে পৃথিবীর মানুষ ভাবেই না। কোনো জনপদই আর্থসামাজিক ঘাটতির অনুপাতে হজ্বের অর্থ বিভাজন বাচক ফেরত পাওয়ার দাবি করে না। যা রাসুলুল্লাহ নির্দেশিত ইসলামের আর্থসামাজিক প্রযুক্তি বিরোধী।

সৌদি বাদশাহর ছেলে মুহাম্মদ বিন সালমানের পুঁজি-লগ্নি

যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমানের কী পরিমাণ অর্থলগ্নি হয় তার হিসেব পাওয়া অসম্ভব। শুধু আই টি কোম্পানিগুলিতে তার লগ্নি কমপক্ষে ১০০ বিলিয়ন ডলার, সফট ব্যাঙ্কে ১০০ বিলিয়ন ডলার, ...। সৌদি আরব আমেরিকা ও ইজরায়েল থেকে প্রচুর অস্ত্র কেনে। ২০১৮ সালে আমেরিকাকে ৭ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকার অস্ত্র কেনার অর্ডার দিয়েছে। জার্মানি, কানাডা ও অন্যান্য দেশ থেকেও অস্ত্র কেনে সৌদি আরব। সেই অস্ত্রে কোন জনপদ ধ্বংস হয় তা সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমান সেই কুক্ষিকৃত অর্থ প্যালেস্তানিদের দিয়ে জেরুজালেমকে কিনে ইজরাইলের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। প্যালেস্তাইনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস রাষ্ট্রপুঞ্জে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ভাষণ দিতে গিয়েছিলেন Jerusalem Is Not For Sale প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে। মুহাম্মদ বিন সালমান ১৯/০২/২০১৯-এ ভারতে এসে ৭ লক্ষ ৭২ হাজার কোটি টাকা লগ্নির প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই রকম পৃথিবীর মানুষের হকের অর্থ অনেক জনপদে লগ্নি করেন। যেখানে ইসলাম বা কমিউনিজমে লগ্নির কোনো বিধান নেই। কেননা দর্শন নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির বিধান দেয়।

ছদ্মবেশে সীতা মানে শান্তি হরণ

আর্থসমাজের উন্নয়ন বা রোহিঙ্গা, উইঘুর বা আরবের জনপদগুলোর শরণার্থী সমস্যা নিয়ে সৌদি পৈতৃক ক্ষমতার কখনই কোনো মাথা ব্যাথা নেই, পৃথিবীর কোনো সমস্যা নিয়ে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায় না। হজ্বে সংগৃহীত অর্থ ইসলামের আর্থসামাজিক প্রযুক্তি প্রয়োগ বা মেধা-মানবতা বিকাশে সেই ক্ষমতা লগ্নি করে না। মানুষকে ধারণাবন্ধ করতে যৎসামান্য ছড়ায়। মানুষ যত ধারণাবন্ধ হবে, জাকাত প্রযৌক্তিক অর্থনীতি তাদের অজানা থেকে যাবে। যে প্রয়োজনীয়তায় রাসুলুল্লাহ হজ্বের বাস্তবায়ন করেছিলেন, পৃথিবীর মানুষ তার ফসল দীর্ঘদিন ভোগ করেছে। এখন রাজনৈতিক সচেতন না হয়ে শুধু ধারণাবন্ধ হয়ে পৃথিবীর মানুষ হজ্বে যান। খুব সহজেই বিশ্ব থেকে হজ্ব উমরার অর্থ কুক্ষি হয়ে যায়। যা সেই ক্ষমতার একমাত্র উদ্দেশ্য। সংগ্রাম না করে, রাজনীতি না করে, নির্বাচনে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত না হয়েই পৈতৃক ক্ষমতায় পড়ে পাওয়া চোদ্দআনায় বাদশাহ হয়ে যায়, যা ইসলাম বিরোধী। হজ্বের প্রযুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় ধর্মের নামে ছদ্মবেশী শোষণে মুসলিমদের শান্তি হারিয়ে যায়। মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও হজ্বের কারণে মুসলিমরা দুবার শোষিত হয়। কীভাবে মূষিক তাদের শ্রমার্জিত সমাজ-বিকাশী অর্থ হাতির পেটে ঢুকিয়ে দেয়, তা সমাজ-মানস বুঝতেই পারে না। তাই বিশ্বে মেধা-মানবতার বিকাশ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সংগৃহীত হজ্বের অর্থ থেকে বিভিন্ন জনপদকে তাদের ঘাটতি সম্পূরক অর্থ দিতেই হবে।

দর্শনহীনতায় আর্থসমাজে নেতৃত্ব থাকে না

আলকোরান না বুঝে আবৃত্তি করতে পারলে তিনি মুসলিমদের ইমাম মানে আর্থসামাজিক নেতা হয়ে যান। যে নেতা সাহিত্য, মনোবিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে কিছুই জানেন না। ইসলামের আর্থসামাজিক প্রযুক্তি জানেন না, তা প্রয়োগও হয় না। ওয়াক্তিয়া, জুম্মা, ঈদ ও হজ্বে ইমামতি অর্থাৎ আর্থসমাজ শ্রমের তত্ত্বাবধানী রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্রমোত্তরণের প্রযুক্তি হয়ে গেছে অকেজো। ইমাম হয়ে যায় কেবল প্রথা পালনী অনুষ্ঠানে আবৃত্তিকার। সেই আবৃত্তিকারের পেছনে থাকেন— সেই সমাজের শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার, এইরকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক একাডেমিক মেধা। এমন কি রাজনৈতিক নেতৃত্বও ইমামের পেছনে থাকেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নামে তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে একত্রিত হয়, কিন্তু রাজনীতি থেকে দূরে থাকে বা সেই সমাজের সমস্যা নিয়ে কোনো আলোচনা করে না। ইসলামের আর্থসামাজিক প্রযুক্তি জানার চেষ্টা করে না। সমস্যায় সেই সমাজ জর্জরিত থাকে। শোষণ, নিপীড়ন, ইত্যাদি সমস্যা সহ সেই সমাজ পুরোপুরি ইমামের নিয়ন্ত্রণহীন থাকে। বরং সেই সমাজ চলে যায় শোষকের কব্জায়। রাজনীতি ছাড়া ধর্ম হয়ে যায় ধারণাবন্ধ করা প্রথাপালন। শোষক শোষিত একসাথে প্রথা পালন করে। ধর্ম মানব দেহের মেরুদণ্ডের ন্যায়, রাজনীতি পেটের ন্যায় আর অর্থনীতি হৃৎপিণ্ডের ন্যায়। যেমন দেহের যে কোনো অনিয়ম হৃৎপিণ্ডকে আঘাত করে, তেমনি সমাজের অনিয়ম অর্থনীতির উপর আঘাত হানে। অর্থাৎ ধর্ম-রাজনীতি-অর্থনীতি এর সম্পর্ক ছিন্ন হলে কী হয় তা ঘর থেকে শুরু করে পৃথিবীর ঘটনাবলী দেখলেই বোঝা যায়। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ক্রমোত্তরণ হয় নীতি আদর্শের ভিত্তিতে মানে দর্শনের প্রয়োগে।

মুহাম্মদ বিন সালমান দিল্লি এসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর সাথে আলিঙ্গান করলেন। হজ্বের কোটা ১,৭৫,০০০ থেকে বাড়িয়ে ২,০০,০০০

করে গেলেন। সালমান কোন মসজিদে গেলেন? কোন নেতৃত্ব উনার সাথে আলিঙ্গান করলেন? তাদের কোন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেন? ৩৪ বছরের সালমান এত অর্থ কোথা থেকে পেলেন? ২৫,০০০ হজ্ব যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কে বা কারা নিলেন? এতে মুসলিমদের প্রতিবছর প্রায় ৯০০ কোটি টাকা খরচ বাড়বে এবং এই অর্থ দেশের বাইরে যাওয়ায় মুসলিম দেশগুলোর মতো এই দেশের অর্থনীতিও ভেঙে পড়বে। মুসলিমদের ধর্মীয় নেতৃত্ব এই সব বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করেন না। সেই সমাজের একাডেমিক ডিগ্রিধারী ব্যক্তি যারা ঐ ইমামের নেতৃত্বে চলেন তারাও এই বিষয়গুলি নিয়ে ভাবেন না। সাচার কমিটির রিপোর্টের পর মোয়াবিয়ার মতো অনেক স্বঘোষিত নেতা তৈরি হলেন। এই সংকট উত্তরণী মেধা -মানবতা বিকাশে আর্থসামাজিক প্রযুক্তি প্রায়োগিক গবেষণা তারা কেউ করেন না। সমস্যার কারণ উদঘাটন না করে সমস্যার সমাধান করতে গেলে হিতে বিপরীত হয়। যেমন হয়েছে মুসলিমদের অবস্থা, জাতপাতের সংক্রমণে তারা নানান ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। তাতে তারা দর্শন প্রযৌক্তিক পথ নির্মাণ করতেও পারে না, সুন্নত কী তা জানে না, দলীয় ঐক্যে একত্রিত হতেও পারে না, অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণও (জাকাত প্রযুক্তির বাস্তবায়ন) করতে পারে না। অর্থাৎ তাদের পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ কাল পাত্র ক্ষেত্রিক ইতিহাস সৃষ্টি না করা। ১৩৫৮ বছরের জীবন গ্যাপ (ক্বাজা)।

মুসলিমদের আর্থসামাজিক অবস্থান অন্যান্যদের সাথে তুলনা করা যায় না

অন্যান্য ধর্মীয় সেন্টিমেন্টগত সম্প্রদায় নিজেদের অর্থ দেশের বাইরে এই রকমভাবে ঘাটতি আনুপাতিক বিভাজন বাচক ফেরত নিঃস্বতায় খরচ করে না। ধর্মের নামে তাদের যাবতীয় খরচ দেশের মধ্যেই। তাতে দেশের অর্থনীতি কিছুটা গতি পায়। তারা নিঃস্ব হয়ে যায় না। মুসলিমরা তাদের সারা জীবনের উপার্জন জীবনের শেষে হজ্বে খরচ করে দেশের বাইরে। তাতে দেশের অর্থনীতি অচল হয়। তাই অন্যান্য ধর্মীয় সেন্টিমেন্টগত সম্প্রদায়ের সাথে মুসলিমদের আর্থসামাজিক অবস্থান তুলনা করা মুর্খামি।

সংগ্রাম হওয়া উচিত শোষণের বিরুদ্ধে

ধনাবর্জনা রূপ পরগাছা পুঁজি চায় মুক্তবাজার অর্থনীতি। তাই পুঁজির মুখ গণতন্ত্রের পক্ষেই সওয়াল করে। গণতন্ত্রে মাথা প্রতি ভোটে কখনই পাণ্ডববর্গ মানে জন বা রণ নির্বাচিত হয় না। তাই যে সমাজে ধর্মরাজ নির্বাচিত হয় না, সেই সমাজে ধর্ম ও রাজনীতি দুটোই হারিয়ে যায়। মানবতা হারিয়ে রাজনীতিকদের নীতি আদর্শ বলেও কিছু থাকে না। বেশির ভাগ রাজনীতিক ব্যক্তিকতায় কাজ করেন, অখণ্ডবোধে জনপদের উন্নয়নে দলের হয়ে কাজ করেন না। দর্শনহীনতায় রাজনীতিকরা রাজনৈতিক দল খাড়া করে ব্যক্তিকতায় পুঁজির হয়েই কাজ করে, সেই সমাজের শোষণ বেড়েই যায়। তাই লড়াইটা সম্প্রদায়গত বা জনপদগত নয়, শোষণের বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রাম হওয়া উচিত। পুঁজির পরগাছা মুখ তার শোষণ আড়াল করতে, কখনও ধর্মীয় সেন্টিমেন্টের মধ্যে দাঙ্গা বাধানো, কখনও এক জনপদের সাথে অন্য জনপদের যুদ্ধ বাধানো। তাই সেই মুখ প্রত্যেক জনপদের মধ্যে বা প্রত্যেক সেন্টিমেন্টের মধ্যে সংঘাতের সংক্রমণ করে, যাতে তার প্রয়োজনে মাঝে মধ্যেই সেই সংঘাতগুলো ব্যবহার করতে পারে। মানবতা দানবতা গুলিয়ে দিয়ে সেই সমাজকে ঝাপসা করে দেয়। সেই সমাজকে নানান ছলে বিভাজনী অকাজ অপকাজে মাতিয়ে দেয়, যাতে তারা শোষণের বিরুদ্ধে একত্রিত হতে না পারে।

মানবতা প্রতিষ্ঠার জন্য অখণ্ড দর্শন তত্ত্বের প্রযুক্তি

প্রয়োগ করতে হয়

সেন্টিমেন্ট বিশেষিত সমাজে পুরাণ তত্ত্বের ধারণা বাহিতা থাকলেও, শক্তি বাচক বিশ্বাসে তার রাজনৈতিক প্রয়োগ হয়নি। একই ঘটনা বৌদ্ধ দর্শনের ক্ষেত্রে। দুটি জ্ঞানের রাজনৈতিক প্রয়োগ হয়েছিল— একটি আলকোরান এবং অপরটি দ্যস ক্যাপিট্যাল। দুবারই দুর্যোধন ঐতিহাসিকভাবে বন্দি হয়েছিল। এই কারণে পুঁজি এই দুটি জ্ঞানের অনুসারীদের উপর আঘাত হানে। দর্শন তত্ত্বের অখণ্ডতা উপলব্ধি করতে না পারায় দর্শনের আলাদা আলাদা অনুসারী হয়ে গেছে। অখণ্ড দর্শন তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারলে, পুরাণ, বৌদ্ধ দর্শন, আলকোরান ও দ্যস ক্যাপিটালের সকল অনুসারীবর্গ একত্রিত হয়ে সেই তত্ত্বের কাল পাত্র ক্ষেত্রিক আর্থসামাজিক প্রযুক্তি নির্মাণ করতে পারত। তাতে সাহিত্য, মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান আর্থসমাজে প্রয়োগ করার সাংস্কৃতিক তৎপরতায় তারা সেই সমাজকে সচেতন করতে পারত। তারা মানবতা ও দানবতা, ন্যায় ও অন্যায়, শোষক ও শোষিত ইত্যাদির পার্থক্য করতে পারত। সেই পার্থক্য করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে মানবিক শক্তির উত্থান ঘটাতে পারত। যে শক্তি-সুগম অখণ্ড দর্শন তত্ত্ব প্রযুক্তির রাজনৈতিক প্রয়োগে তারা কাল পাত্র ক্ষেত্রিক অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হতে পারত।

‘রক্ষণাত্বক মানস ও বিকাশশীল মনন’

কিংশুক

আমাদের একটা দুর্বল মানসিকতা হল যখন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কার্যাবলীর কিছু কাজ বা বিষয় আমাদের ভাল লাগে তখন আমরা সেই ভালো লাগাকে তার সমস্ত কিছুর সাথে মিলিয়ে-মিশিয়ে ফেলে। উক্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাজের কোনো রকম আর বিচার-বিবেচনা না করেই সবটাই মেনে নিতে থাকে। মেনে নেওয়ার পটভূমিতে তাদের দেয়া কিংবা নিজেদের ইচ্ছে মতো কল্প-কাহিনীর আশ্রয় নেয়। তাদের প্রতি গদগদভাব নিয়ে আসে। সেই ঘটনাতে আমাদের জীবন-সমস্যার নিরসনের কোনো উল্লেখ থাক বা না থাক। আমাদের এই বিচারহীনভাবে মেনে নেওয়ার এবং সম্মোহিতভাব মানসকে তথাকথিত ভক্তি বলে। আর আমরা যারা মেনে নিই তাদের তথাকথিত ভক্ত বলে। অর্থাৎ একে রক্ষণাত্বক মানসও বলা যায়।

তবে এখানে উল্লেখ্য যে, ভক্তি কিংবা ভক্ত কোনোটিই নেগেটিভ বিষয় নয়। দুটিই পজিটিভ বিষয়। আমরা তাকে উল্টো করে নিয়েছি। কীভাবে? গীতায় মানব জীবনের উন্নয়ন তথা বিকাশ লক্ষ্যে পথ নির্দেশ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি অর্থাৎ জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের সুসামঞ্জস্য বিধানেই জীবন মুক্তি সম্ভবপর। কিন্তু এই তিনের স্বতন্ত্র বা খণ্ড খণ্ড বাস্তবতা বস্তু স্বীকৃত নয়। এর অর্থ হল জ্ঞানার্জন ছাড়া কর্ম বা life leading without practice of knowledge এবং জ্ঞানার্জন ও life leading with practice of knowledge ছাড়া ভক্তির কোনো বাস্তবতা নেই।

এখন প্রশ্ন হল জ্ঞান অর্জন কেন করব, কিসের জ্ঞান? জ্ঞানার্জন বলতে মানব সত্তা তথা আমিত্বের জ্ঞান। এর স্বরূপ এর প্রকৃতি। এই স্বরূপ বা প্রকৃতরি বস্তুভিত্তিক চিহ্নায়নে সত্তানিহিত আমিত্ব বিকাশ লক্ষ্যে শ্রম তথা কর্মের নির্দেশিকা। তাই কর্ম কিন্তু সেই আমিত্বের উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই। জ্ঞান-কর্মের এই যুগলবন্দিতে ভক্তি কিসে? ভক্তি হল সেই আমিত্বেই যা বিকাশমান পূর্ণামিত্বমুখীন। জ্ঞানের প্রকরণেও যুক্তি-তর্কের বস্তুভিত্তিক সম্পাদনা। কর্মে সেই যুক্তিতর্কের সম্পাদনাকে প্রতিপাদন করা। আর ভক্তি যুক্তিতর্ক ভিত্তিক জ্ঞান সম্পাদনা ও তার প্রতিপাদনে মানব আমিত্বের যে নৈব্যক্তিক স্বরূপতা তাতে-ই। তাহলে জ্ঞান যেমন, কর্ম যেমন, ভক্তিও তেমন মানব আমিত্ব উন্নয়নের বস্তু অভিযোজনা। কিন্তু জ্ঞানহীন কর্ম বা জ্ঞান - কর্মহীন ভক্তি বলে বস্তুতে কিছু হয় না।

সত্তায় থাকা রক্ষণকামিতার বিপরীতে আমিত্বের অনভূতি পাওয়া যায় বিকাশশীল মননে। আমরা যখন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাজকে বিনা বিচারে মানি না, ঘটনা বা কাজের বিশ্লেষণ করি, তার যতটা সম্ভব মাত্রাগত দিক থেকে আমাদের জীবনকে পজিটিভলি কতটা প্রভাবিত করতে পারে, তার বাছ-বিচার করে থাকি। আমাদের এই মানসিকতাকে যুক্তিতর্ক বলে আর এই মানসিকতা যারা দেখাতে পারে তাদের যুক্তিবাদী বলা হয়। অর্থাৎ একে বিকাশশীল মনন বলে।

রক্ষণাত্বক মানসের দ্বারা পরিচালিত হলে নিজেদের অজান্তে কখন আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেলি তা দেখার সুযোগ হয় না। এরকম চলতে থাকলে বিকাশশীল মনন অর্থাৎ আমিত্ব ধীরে ধীরে লীন হতে থাকে। কিন্তু পদার্থের মত বিলীন বা নশ্বর হয় না। আমাদের এইরূপ মানসের একটা উদাহরণ নিলে বিষয়টি

পরিষ্কার হয়। ধরা যাক, বিরাট কোহলি কথা। তিনি খুব ভাল ক্রিকেটার। তার এই খেলা দেখে আমাদের কারোর খুব ভাল লাগল। কিন্তু এর পর তার পরবর্তীকালের খেলা কিংবা আর্থসমাজের ঘটনায় কোনো মতামতকেও আমরা পূর্বের ভাল লাগার সাথে যোগ রেখে আর কোনো চিন্তা করিনা। সেটা ভাল না মন্দ, ঠিক না ভুল, মতামতটি জীবনে প্রাসঙ্গিক না অপ্রাসঙ্গিক তা আর দেখি না। তার সবই ঠিক। যেহেতু সেই ব্যক্তির কোনো একটা বা একাধিক খেলা আমাদের ভাল লেগেছে, তাই তার সবই ভাল। এমনকি আমরা তাকে নকল করতে থাকি, তার চলা, বলা, শারীরিক কাট-ছাঁটের। আমাদের এই বিচারহীন, অনুসরণ ও অনুকরণীয় মানসিকতাকেই রক্ষণাত্বক মানস বলে।

উপরের উদাহরণটি খেলাধূলার ক্ষেত্রের বলে এর সংক্রমণ আর্থসমাজ জীবনে পরিধিগত মাত্রা খুব বেশি হয় না। কিন্তু যদি সেটা কোনো আর্থসমাজ-সাংস্কৃতিক কিংবা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঘটে, তবে এর পরিণাম আমাদের জীবনপ্রবাহে প্রত্যক্ষভাবেই পেতে হয়। কেননা এর পরিধিগত ব্যপ্তি ক্রীড়া ক্ষেত্রের তুলনায় অনেক বেশি। বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এইরূপ রক্ষণাত্বক মানস দেখা দিলে চরমভাবেই এর দূর্ভোগ পোহাতে হয়। রাজনৈতিক পছন্দ-অপছন্দের মাধ্যমেই আমরা আমাদের আর্থসমাজ পরিচালনার নেতৃত্বকে নির্ধারণ করে থাকি। যাদের দায়িত্বে আনি, তারাই সেই আর্থসমাজের শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্যনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞাননীতি প্রভৃতির বিন্যাসনী ব্যবস্থাপনার রূপরেখা দিয়ে থাকেন। আর এর জন্যই আমাদের ঔচিত্য সচেতন, মূল্য সচেতন এবং মূল্যের বিনিময় সচেতন হতে হয়। 'মনে রাখা দরকার ব্যক্তি যখন ঔচিত্য সচেতন তখন সে নাগরিক, যখন মূল্য সচেতন তখন সে রাজনৈতিক, যখন সে মূল্যের বিনিময় সচেতন তখন সে সামাজিক।' (অস্তিত্ব)। ব্যক্তির নাগরিক চরিত্র অর্থাৎ বাছ-বিচার, ভাল-মন্দ, ঠিক-ভুল না থাকলে সে কখনোই তার কাঙ্খিত জীবনমালা সজ্জার নেতৃত্বের নির্বাচন করতে পারে না। আর যদি তার সামাজিক চরিত্র অর্থাৎ শ্রমমূল্যের বিভাজন, বিভাজিত মূল্যের বিন্যাসন করতে না পারে তাহলেও সে তার জীবন বিকাশক বস্তুবাদী নেতৃত্ব নির্বাচনে ব্যর্থ হয়। একই সঙ্গে সামাজিক চরিত্র অর্থাৎ মূল্যের বিনিময়ের সচেতনা আনতে না পারে তবে সে ব্যক্তিপ্রধান অনুভূতিতে বিব্রত বোধ করে। তাহলে এই তিনটি চরিত্রের কোনো একটি না থাকলেই আমরা আমাদের মানবাধিকারের প্রত্যাশা কিংবা তার লড়াই এ সামিল হতে পারিনা। আর শুধু তাই নয় এর বিপরীতের বিকাশশীল মননকেও আমরা আমাদের অজান্তেই আঘাত করতে থাকি। রক্ষণকামিতার হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হই। আর্থসমাজ জীবনে নামিয়ে আনি অস্থিরতা। রক্ষণকামিতাও তার ক্ষমতার তখত বহাল-বলবৎ করে ফেলে।

রক্ষণাত্বক মানসের বিপরীতে অবস্থান করে আমাদের বিকাশশীল মনন। বিকাশশীল মনন বিকাশের ধারায় স্বাচ্ছন্দ্য চায়। বিকাশের এই ধারাকে অব্যাহত রাখতে অর্থাৎ এই মনন গঠনে আমাদের কী করা দরকার। না , আমাদের সম্মুখে যে ঘটনা বা বিষয় আসবে তাকে সে বিষয়ের নিরিখে দেখতে হবে। ব্যক্তিকতার উর্দ্ধে ওঠে দেখলে বিষয়ের চরিত্র নির্ণয়ন ও নির্ধারণ বস্তুগত ভাবে হবে। প্রথমেই বিষয়টিকে প্রশ্নবাচকভাবে নিতে হবে।

তারপর তার আর্থসমাজ-সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিগত লাভ-অলাভের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এক বা একাধিক সমকালভিত্তিক সিধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এই ঘটনা সংগঠিত করতে পারলে ব্যক্তি যেমন নিজের নেগেশন সম্পর্কে সচেতন হবে, তেমনি আর্থসামাজিক

নেগেশনকে ধরতে পারবে।

এখন প্রশ্ন হল ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিকতা থেকে বেরতে গেলে অর্থাৎ কিনা বিষয়কে বিষয়ের নিরিখে দেখতে গেলে কিসের উপর ভর করে এই যুক্তিবাদী মনন গড়বে? অবশ্যই এই ভিত্তি হবে মানবতার ভর দিয়েই। আর মানবতার অর্থাৎ আমিত্বের চার্চিক হতে গেলে কারোর কাছে নিজের বিবেক, মস্তিস্ক অর্থাৎ সত্তার অ্যাফারমেশনকে কোনো কিছুর বিনিময়ে বন্ধক রাখলে হবে না। সেটা হতে পারে কোনো ধনের বিনিময়ে, প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে, ক্ষমতার বিনিময়ে কিংবা নিজস্ব তাড়না অর্থাৎ নেগেশনের কবলে পড়ে। স্ব-এর অধীন হতে হবে অর্থাৎ আমিত্বের অধীন। তাহলে আমরা বলতে পারি ব্যক্তিসত্তা ও আর্থসমাজ সত্তার নেগেশন মুক্তির প্রয়াসী হলেই ব্যক্তি মানবতা তথা আমিত্বের চর্চার মহাযজ্ঞে নিজেকে সামিল করতে পারবে। তখনই সে তার অধিকার আদায়ের মহাকর্মযজ্ঞে লড়াই করার শক্তিও পেয়ে যাবে। যে শক্তির কাছে উপরে উল্লিখিত রক্ষণাত্বক মানসের রক্ষণকামিতার ছলা-কলার জাল যতই বিস্তার করুক না কেন, তা পরাজিত হবে। এর জন্য জ্ঞান চর্চারও প্রয়োজন। আমিত্বের স্বরূপ উপলব্ধির দরকার। আমিত্ব কীসে প্রীত হয়, আর কীসে তা যন্ত্রণায় পড়ে তা জানা আবশ্যক। কারণ চেতনার উর্দ্ধে ওঠতে গেলে অবশ্যই শক্তির প্রয়োজন, সাধনার প্রয়োজন, ত্যাগের প্রয়োজন, আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন, যুক্তির প্রয়োজন, হৃদয়বৃত্তির প্রয়াজন, আত্মত্যাগের প্রয়োজন, অবদানের প্রয়োজন, প্রেমের প্রয়োজন, বক্ষোপ্রসারের প্রয়োজন, সূক্ষ্ণতার প্রয়োজন, গভীরতা প্রয়োজন, তীব্রতা -তীক্ষ্ণতার প্রয়োজন, প্রতিবাদের প্রয়োজন, প্রতিকরণের প্রয়োজন, প্রতিশোধনের প্রয়োজন, মোকাবিলার প্রয়োজন, শিক্ষার প্রয়োজন, সংস্কৃতির প্রয়োজন, শ্রমের প্রয়োজন, শ্রমমূল্য বিভাজন, বিন্যাসনের প্রয়োজন, বিন্যাসনী মূল্যের ব্যবস্থাপনার দেখভালের প্রয়োজন। এক কথায় বললে জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রামের ত্রিশূল প্রযুক্তিছাড়া কখনোই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর নয়। এই ত্রিশূল প্রযুক্তিতেই অধিকার প্রতিষ্ঠার কর্মযজ্ঞের রথযাত্রার সূচনা ঘটে।

মানুষের ধর্ম

'অস্তিত্ব' নিরিখে বিশ্লেষণ ও সংকলনে – উজান

বহুল শ্রুত যে কথাটি সেটি হল, 'ধর্ম মানুষের অন্তরের জিনিস'। কথাটি কে বলে? কেন বলে? এর পিছনে কোনো দূরভিসন্ধি আছে কিনা আসুন দেখা যাক।

ধর্ম কী?

ধর্ম হল ধারক অর্থাৎ ইউনিভারসাল ল। এই ল বা নিয়মে ব্যক্তি নিজেকে এবং তার আর্থসমাজকে নিয়মানুগ করলেই আর্থসামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এককথায়, 'ধর্ম হল তাই-ই যা আর্থসমাজ জীবনের শান্তি সার্বিক সারবত্তা'। (অস্তিত্ব)

চুরি করাকে ন্যায় বলার মানুষ আর্থসমাজে একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু এই শান্তিবাচক সার্বিক সারবত্তা অর্জন করতে পারার প্রথম শর্তই হল ব্যক্তির শ্রমমূল্যের উদবৃত্ত অংশের হেফাজতি ত্যাগ, যার চুরি নয়।

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা

রক্ষ কথিত আধ্যাত্মিকতা হল আর্থসমাজ জীবনের যাবতীয় সমস্যা থেকে উদাসীন হয়ে মুখ ফিরিয়ে শামুকের মতো আত্মখোলসে ঢুকে যাওয়া। এই নিস্ক্রিয় হয়ে আত্মগুহায় ঢুকে গেলেই আর্থসমাজের সমস্যা সমাধান তো দূরের কথা সমস্যা আরো বেড়ে যায়। বাস্তবে আধ্যাত্মিক শব্দটি একটি পজিটিভ শব্দ। যার সংজ্ঞা হল, 'যা ইপ্সিত বস্তুর অধিকারগত বাস্তবতাকে সম্পাদনী প্রতিপাদনে প্রতিপন্ন করে।' অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা হল, আপেক্ষিক আর্থসমাজ মানবতার অধিকারকে আর্থসমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। আধ্যাত্মিকতা শব্দটির উৎপত্তি আগে নয়, আগে হল সত্তা থেকে আমিত্ব নিস্কৃতিক উপলব্ধি। তারপরই নৈতিক সাহসিকতায় আর্থসামাজিক ভ্যানগার্ড তত্ত্বের কর্মসূচি গ্রহণ। আর এজন্যই সত্তার হূড়কো খুলে আত্মগুহা থেকে নিস্ক্রান্ত হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি।

ধর্ম, রাজনীতি ও অর্থনীতি

আর্থসমাজ জীবনের শান্তি সার্বিক সারবত্তা গঠন করতে গেলে দরকার জীবনায়নী শ্রেষ্ঠ নীতির, যার নামই রাজনীতি। যে নীতিতে ব্যক্তিসত্তার আমিত্বিক চরিত্র গঠিত হয় এবং আরেক দিকে Socio self Application যাতে ব্যক্তির আমিত্বিক সত্তা থেকে নিস্কৃতি ঘটে এবং আর্থসমাজ মানবিকতার কর্তৃত্ব আসে।

কিন্তু রাক্ষিক আর্থসমাজে মুক্তবাজার অর্থনীতির ফাটকা বাজারে আজ মানুষ খাবি খাচ্ছে। বহুরূপী রক্ষকে চিহ্নিত করা খুব শক্ত, কিন্তু আপেক্ষিক বস্তুতত্ত্বে অসম্ভব কিছু নয়। রক্ষণকামিতা মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। মানস রক্ষণকামের মৌন সমর্থনের জন্য ড্রাগনদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না, পারেনা জীবনের বস্তুগত গাইডলাইনের অভাবে।

মানুষের রক্ষণকামিতা চায় আর্থসামাজিক সম্পদকে জবরদখল করে নিতে। মানুষ শ্রম দিয়ে যে মূল্য উৎপাদন করে তাতে নিশ্চয় তার হক আছে। এই হক অর্থাৎ আবশ্যিক মূল্য জবরদখলের কথা নয়। আবশ্যিকের অতিরিক্ত যা অর্থাৎ উদবৃত্ত মূল্য সেটিই সে জবরদখল করে। যে উদবৃত্ত মূল্যের আর্থসামাজিক বিন্যাসের নিয়মের নাম অর্থনীতি।

আর্থসমাজ জীবনের শান্তি সার্বিক সারবত্তা গঠন করতে অর্থাৎ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে এই উদবৃত্ত মূল্যের আর্থসামাজিকীকরণ করতে হয়। তারজন্য আর্থসামাজিক ট্রাষ্ট গঠন করতে হয়। সেই ট্রাষ্টের তত্ত্বাবধানী নেতৃত্ব নির্বাচন করতে বাস্তবানুগ নির্বাচন প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে হয়। নির্বাচিত এই তত্ত্বাবধানী নেতৃত্ব আর্থসামাজিক

উদবৃত্ত মূল্য তথা সম্পদের সমকালীন বিন্যাস ঘটায়। মানবসত্তার সূচনাতেই ঘাপটি মেরে থাকা রক্ষণকাম বৃত্তি তখন তার দখলকামনার লকলকে জিভকে লাগাম দিতে বাধ্য হয়। তাহলে ধর্ম, রাজনীতি ও অর্থনীতি স্বতন্ত্র কোনো বিষয় নয়। যেহেতু ধর্ম, রাজনীতি ও অর্থনীতির এই রকম বাস্তবায়নে রক্ষণকামকে পিছু হঠতে হয়, তাই রক্ষের বুলি, 'ধর্ম মানুষের অন্তরের জিনিস'। একে রাজনীতিতে নিয়ে আসা পাপ। ইত্যাদি ইত্যাদি। রক্ষ আড়াল চায়। আড়াল থেকেই সে মানুষকে কবরী অন্ধত্বে ঢুকিয়ে দেয় কখনও ঐতিহ্যের নামে, কখনও ধর্মের নামে, কখনও ধর্মের অনুষ্ঠান পালনের নামে। রক্ষ চায়না মূল্যের হিসাব বুঝিয়ে দিতে। আর তাই সে প্রগতিশীলতার নামে, ধর্মের নামে বিভিন্ন মিথ্যা ইস্যু সামনে তুলে ধরে, — তাতে জীবন উন্নত হয় কী? সমস্যা দূর হয় কী? না হয় না। আর যা হয় তা হল মানুষ আরো মূঢ়মান হয়ে পড়ে। আর কেল্লাফতে হয় রক্ষের। একদিকে আর্থসমাজে ধনের পাহাড়ে ছোট বড় ড্রাগন তৈরি হয় আর আরেক দিকে আর্থসমাজের অধিকাংশ মানুষ রক্ষের শোষণে পিষ্ট হয়ে ত্রাহি ত্রাহি করে — যা আজ জাজ্জ্বল্যমান।

ধর্ম ও সাম্য

রক্ষ কথিত ঐতিহ্যিক ধর্মে আচার অনুষ্ঠানের আবর্তন চলে। কিন্তু তাতে সাম্য প্রতিষ্ঠা হয় কি? নামাজের কাতার প্রদর্শনই কি সাম্য? না, শ্রমের বস্তুগত তত্ত্বাবধানে, উদবৃত্ত মূল্যের যথাযোগ্য আমিত্ব বিকাশনী বিন্যাসনেই সাম্য প্রতিষ্ঠা হয়।

সাম্য অর্থে সবাইকে সমান করা নয়। সাম্য প্রতিষ্ঠা করা মানে আর্থসমাজে মেধা যোগ্যতার বস্তুনিষ্ঠ ক্ষেত্রায়ন ঘটানো। কথাটি সহজ করে বললে কী হয়? রক্ষণকামী যাঁতাকলে পিষ্ঠ আর্থসমাজে মেধা যোগ্যতার কোনো স্বীকৃতি থাকে না। যার ডাক্তার হওয়ার কথা তাকে ইঞ্জিনিয়ার হতে হয়, যার শিক্ষক হওয়ার কথা তাকে কৃষক হতে হয়, যার প্রফেসর হওয়ার কথা তাকে হতে হয় আড়তদার। এবং আরো অসংখ্যের মেধা যোগ্যতানুযায়ী যা হওয়ার কথা তার কোনোটাই হয়ে ওঠার আর্থসামাজিক বাস্তবতা থাকে না। তাহলে যে আর্থসমাজে মানুষ তার মেধাযোগ্যতার স্বীকৃতি পায়না সেখানে ধর্মই বা কোথায় আর সাম্যই বা কোথায়।

পাপপূণ্য ও ধর্ম

আমিত্ব প্রতারণার অপর নাম পাপ। আর্থসামাজিক ঔচিত্যবোধে, দায়িত্ব ও কর্তব্যে আমিত্ব বস্তুর অনুশীলন না করলে পাপ এবং অপরাধ প্রবণতার কারণেই বহিঃ সংক্রমণী অঘটন ঘটে যায়। ঘটনার পোষ্টমর্টেম ছাড়া এই কারণ জানা যায় না। এই কারণ জানার প্রজ্ঞাগত কৃৎকলায় জীবন বস্তুগত মেধা লব্ধি হল পূণ্য। আর পাপের সংক্রমণ শুরু শ্রমিকের মূল্য বঞ্চনা আর আর্থসমাজের উদবৃত্ত বঞ্চনা করে। এটাই হল প্রথম পাপ। 'আমিত্ব প্রতারক সেই ধনাবর্জনার দাপটে দাপটকামী দুর্যোধন হয়ে সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য আর দৃষ্ট সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণে ঐ মূল্য বঞ্চিতদের উপরেই করে অত্যাচার। এটাই হল দ্বিতীয় পাপ। এই পাপের তস্য পাপ থেকে ছড়ায় ধন আবর্জনার দুর্গন্ধ। এগিয়ে আসে হিসাব নিকাশি কেয়ামত।' (অস্তিত্ব)। কী বলতে চাওয়া হচ্ছে? বলবার কথা হল, যা আমার নয় তা আমার বলে জবর দখলটি পাপ। উদবৃত্ত অর্থাৎ জাকাত ব্যক্তির নয়। তা আর্থসমাজের। আর্থসমাজকে এই উদবৃত্ত মূল্য বঞ্চনা করি মানে পাপে নিমজ্জিত হই। আর শ্রমিকের মূল্য বঞ্চনা? উদবৃত্ত বঞ্চনা করতে করতেই এমন অবস্থা আর্থসমাজের করে দিই যাতে শ্রমিকের আবশ্যিক মূল্য না দিয়ে মজুরি নামে হাতে তোলা মূল্য দিয়ে শ্রমিককে বঞ্চনা করাও সহজ হয়ে যায়। এই প্রথম পাপ থেকেই

আর্থসমাজে রাশি রাশি সংক্রমন ছড়াই। মনে ঘটে যাওয়া ঘটনার বহিঃসংক্রমণ এর পোস্ট মর্টেম মানে উক্ত মূল্য চৌর্যের মানসিকতার উদ্ঘাটন না করলে পূণ্যের কাছে যাওয়া যায় না। পুন্যও হয় না।

স্বর্গ লাভ ও ধর্ম

ব্যক্তির মৃত্য পরবর্তী স্বর্গলাভের ধারণা রক্ষের ঢাল ছাড়া কিছু নয় —

'তা না হলে ইব্রাহিমকেও নমরুদের পৈশাচিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগঠন করতে হত না। বুদ্ধদেবকেও পরগাছা নারকীয় ধর্ম ব্রাহ্মণ্য তাণ্ডবের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হত না। ক্রুশ তুচ্ছ করে যিশুকেও রক্ষণকামিতার বিরুদ্ধে লড়তে হত না। মহানবী হজরত মহম্মদকেও জাহেলি অন্ধকারাচ্ছন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আর্থসামাজিক নীতি নির্ধারণী জ্ঞান-বিশ্বাস আর সংগ্রামের ভূমিকায় জেহাদ করতে হত না।

তাঁরা সবাই ব্যক্তিগতভাবে বলে দিতেন, 'যাও তোমরা রসাতলে। আমি এই আর্থসমাজ বস্তুবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত সাধন ভোজনের সিঁড়ি বেয়ে একাই চললাম স্বর্গে।' (অস্তিত্ব)

কিন্তু তাঁরা তা করেন নি। তারা আর্থসামাজিক শান্তির জন্য আর্থসামাজিক স্বর্গ রচনা করেছিলেন। অর্থাৎ স্বর্গ অলৌকিক নয়। কারণ যা অলৌকিক তা কখনও বাস্তব হতে পারেনা। স্বর্গ হল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত আর্থসামাজিক শান্তি সার্বিক কাল পাত্র ভিত্তিক আপেক্ষিক ব্যবস্থাপনা।

আস্তিক ও নাস্তিক

স্বাধীন মানে স্ব এর অধীন। মানুষ যখন তারই নিজ আমিত্বের অনুসারী তখন সে স্বাধীন। কিন্তু যখন সে তার প্রবৃত্তির (কাম, ক্রোধ, লোভ, ইর্ষা, মোহ ইত্যাদি) দ্বারা তাড়িত হয় তখন সে পরাধীন। মানুষের স্ব-বৃত্তি (অর্থাৎ জৈবিক ক্রম অনুকৃতি) তার চেতনার উপর প্রাধান্য বিস্তারের ফলে ব্যক্তি তার আমিত্বকে অস্বীকার করে। এতেই ব্যক্তি নাস্তিক।

আমরা নাস্তিক শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই — না + অস্তি= নাস্তি, অর্থাৎ মানুষের তার নিজেরই অস্তিত্বকে স্বীকার না করা। মহাবিশ্বের নিয়মকে বা মহাস্রষ্টার নিয়মকে বা নিজ অস্তিত্বকে যিনি স্বীকার করেন তিনিই আস্তিক। কিন্তু রক্ষের ধারণাবাহী ঐতিহ্যবাহী তথাকথিত ধর্মযাজকরাই রক্ষ কথিত আস্তিক। আর বস্তুগতভাবে চেতনার নিয়মে যারা আর্থসমাজে মানবতার প্রতিষ্ঠা করতে চান এবং রক্ষকথিত ধর্মের স্বরূপ উদঘাটন করেন তাদেরকেই রক্ষ নাস্তিক হিসেবে চিহ্নিত করে দেয়। আবার মানবজাতির চিরায়ত জ্ঞানগ্রন্থগুলির কোনরকম আলোচনা ছাড়াই সেগুলি সহ রক্ষকথিত গোটা ধর্মতন্ত্রকে কিছু লোক বাতিল করতে চায়। এটা সখ নাস্তিকতা। এই স্বঘোষিত সখ নাস্তিকরা চায় প্রচারের আলো। তাই রক্ষের এদেরকে নিয়ে ভয় নেই। নিজ অজান্তেই এরা রক্ষের হয়ে ভাড়া খাটে।

সর্বধর্ম সমন্বয়

রক্ষ আজ গোয়েবলসী চালে রাবণের দশমুখে যে কথাটি চালু করে নিয়েছে তা হল সব ধর্মেই মোক্ষ পাওয়া যায়। আর সব ধর্মে যে মোক্ষ পাওয়া যায় তা স্বীকার করাই নাকী উদারতা আর প্রগতিশীলতা। রক্ষণকামিতার কুচক্রে যদি ধর্ম ঐতিহ্যে রূপ নিয়ে নেয় তবে সর্বধর্ম সমন্বয়টাই একটি রক্ষের শক্ত ঢালে পরিণত হয়। আর সব ধর্ম মানে? ধর্ম কটা? ধর্ম তো মানুষের একটিই। যা মুক্তির আর শান্তির ধর্ম। আর এই আর্থসামাজিক শান্তি কীভাবে অর্জিত হয়? তা জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রামের ত্রিশূল প্রযুক্তিতে অর্জিত হয়। আর্থসমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা চলাকালীন বা তার আগে সেন্টিমেন্টাল ধর্ম সম্প্রদায়গুলি তাহলে কোথায় যাবে? সমন্বয় নয় মানবিকতা প্রতিষ্ঠার

জন্য সহাবস্থান বলে একটি কথা বস্তুগ্রাহ্য।

ধর্ম নিরপেক্ষতা

ধর্ম দুগ্ধপোষ্য শিশু বা গবাদি পশু নয়, যাকে লালন পালনে ছোটো থেকে বড় করতে হয়। ধর্ম মানব আর দানবের মধ্যে অবশ্যই মানবতারই পক্ষে।

ধর্ম যদি নিরপেক্ষ হত তবে পাণ্ডবের জয় অর্থাৎ ধর্মের জয় আর কৌরবের অর্থাৎ অধর্মের পরাজয় ঘটত না।

ধর্ম নিরপেক্ষ কথাটি আওড়ালেই যদি তা নিরপেক্ষ হয়ে যায়, তবে তা ধর্ম-অধর্মের মাঝে পদক্ষেপহীন স্ট্যাচু মাত্র। অর্থাৎ বাস্তবে ধর্মনিরপেক্ষ বলে কিছু হয় না।

ধর্ম ও বিজ্ঞান বিরোধ

যা আমিত্বের অধিকারগত অয়ন তাই অধ্যায়ন বা শিক্ষা। এই শিক্ষাগত অভিযোজনে বিজ্ঞান মানবজীবনকে শুভেচ্ছায় আশীর্বাদ করে, জীবনকে উন্নত করে। বস্তুত আল কোরান তথা ইসলামের সাথে বিজ্ঞানের কোনো বিরোধ নেই, কারণ আল কোরান তথা ইসলাম নিজেই বিজ্ঞান। তবে বিরোধ কাদের সাথে?

বিরোধ কেবল রক্ষ ইন্ধনে খাড়া করা ধর্মযাজকদের সাথে। চোখে খোঁচা দেওয়া উদাহরণ— রক্ষ একদা গ্যালিলিও, কোপারনিকাসের পিছনে লাগিয়ে ছিল পোপকে।

কিন্তু বিজ্ঞান যদি বিজ্ঞানের নামে জড়বিজ্ঞানে রূপ নেয় তাহলে তা মানবতার কাজে লাগেনা। দানবতাকেই তা মওকা দেয়। এই অবস্থায় নিঃসন্দেহে তা মানবতার ধর্মের বিরোধী।

রক্ষের কাছে আর্থসমাজ মানবতার প্রশ্ন

তুখোড় ধড়িবাজ রক্ষের কাছে সমাজ মানবতার প্রশ্ন, ধর্মের নামে যা মানুষকে সৃষ্টিশীল করে না, মানুষের জীবনকে উন্নত হতে দেয় না, মানুষকে জ্ঞানচর্চা হতে বিরত করে, অধিকারহীন মানুষের মোটা নিঃশ্বাসেও যাতে ঘা লেগে যায়, যা মানুষের অমূল্য প্রাণকে বিনষ্ট করে, তা কেমন ধর্ম! মানুষ ধর্ম বাঁচায়, না ধর্ম মানুষ বাঁচায়?

মূল্য বিশেষিত মানবসত্তা

‘অস্তিত্ব’ নিরিখে বিশ্লেষণ ও সংকলনে — প্রভাস

শ্রম কী? শ্রম হল তাই যা আপেক্ষিক মেধা বিশেষিত মূল্য উৎপাদক। মূল্য কী? মূলের পরিণতিগত বিকাশক। মূল কী? তা হল সত্তানিহিত আমিত্ব। শ্রম শক্তিনিহিত আমিত্ব সৃষ্টি ও বিকাশেয় ভোগ্য উৎপাদন। সত্তা কী? সত্তা হল দ্বান্দ্বিক কাল সংঘর্ষক। (অস্তিত্ব)

মানব সত্তার দুটি দিক একটি নেগেশন অন্যটি অ্যাফারমেশন। নেগেশন হল নিজের দেহমনকে নিয়ন্ত্রণ না করতে পারা বা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে না থাকা। নিয়ম মানা বা না মানা তার ইচ্ছা শক্তির উপর নির্ভর করে। যে পজিটিভ শক্তি দিয়ে কাম, ক্রোধ, হিংসা, মোহ, ইর্ষা, লালসা, হতাশা ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তাহলে পজিটিভ শক্তি কী? পজিটিভ শক্তি হল মানুষের মধ্যে থাকা শুভ দিকটি। যা আমিত্ব শক্তি। যা তাগিদবাহী। নেগেটিভ শক্তির তাড়নার ফলে সর্বদাই খারাপ কাজের দিকে টানে। নতুন কিছু সৃষ্টি হয় না। নেগেশন নিয়ন্ত্রণ করলে চেতনা সর্বদাই বর্তমান থাকে। কাজ করতে আনন্দ পাওয়া যায়। নতুন ভাবনার উন্মেষ ঘটে। যে ভাবনায় মানুষের সমকালীন আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানের দিক প্রশস্ত হয়।

মানুষকে শ্রম দিয়ে উৎপাদন করে শ্রমমূল্য তৈরি করতে হয়। সেই শ্রমমূল্যের একটি অংশ ব্যক্তির নিজের যা আবশ্যিক। আবশ্যিক মূল্য দিয়ে তার উপর নির্ভরশীলদের থাকা, খাওয়া, পরা, চিকিৎসা, বিনোদন, শিক্ষা, যাতায়াত ইত্যাদি দিকগুলি এখান থেকে নির্বাহ করতে হয়। (যা মানবিকতা প্রতিষ্ঠার একটি দিক)। এটা মানবজাতির আবশ্যিক দিক। ব্যক্তি কর্মক্ষেত্র অনুযায়ী শ্রম প্রয়োগ করে যে মূল্য উৎপন্ন করে তার এই অংশটি আবশ্যিক। শ্রমমূল্য থেকে আবশ্যিক অংশ বাদ দিয়ে যে অংশটুকু থাকে তা তার উদবৃত্ত মূল্য। এখানে প্রশ্ন হল উদবৃত্ত মূল্যটি কার? খুব সহজেই বলা যায় পরবর্তী মূল্যটি আর্থসমাজের। আবার প্রশ্ন হল আর্থসমাজকে কেন উদবৃত্ত মূল্য দিতে হবে? উদবৃত্ত অংশটি ব্যক্তির নিজ কুক্ষিগত হয়ে গেলে তা আর্থসমাজে বিকেন্দ্রীকৃত হয় না। বিকেন্দ্রীকরণের কোনো জায়গা থাকে না। পরবর্তী অধ্যায় রচনার জন্যই ব্যক্তি উদবৃত্ত মূল্য ত্যাগ করবে। মহাবিশ্বের নিয়মেই যা তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত, যেটা আর্থসমাজের। মহাবিশ্বকে তো উদবৃত্ত মূল্য অর্পণ করা যায় না। তার জন্য প্রয়োজন আর্থসামাজিক ফাণ্ড বা তত্ত্বাবধায়ক তহবিল। এই ফাণ্ড তখন নির্ধারণ করবে উদবৃত্ত মূল্যের যথা বিহিত ব্যবস্থা দানের।

আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে মানবিকতা বিকাশের জন্য কী কী ভূমিকা রাখা প্রয়োজন তা আর্থসামাজিক ফাণ্ডের তত্ত্বাবধায়কগণ ঠিক করবে। অর্থাৎ যে উদবৃত্ত মূল্যকে আমার বলে কুক্ষিগত করি তা আসলে আমার নয়, আর্থসমাজ বিকাশের জন্য। কিন্তু ধনের পাহাড় জমিয়ে তা দিয়ে বিকাশকে ব্যহত করা হয়। কারণ তার রক্ষণকাম মানসিকতার জন্য। মানুষ জন্মগত ভাবেই অনধিকার দখলকাম মানসিক। তাই তাকে আমিত্বের চর্চা করতে হয়। নিজ সত্তায় থাকা আছোটকে দূর করার জন্যই প্রয়োজন কর্ষণের। কর্ষণ না করলে আছোট থেকে যাবে, আর নিজেরই রক্ষণকামিতায় আবর্তিত হতে হবে।

নিজের ঘাড়ে বেপে বসা কুক্ষিগত ধনকে আর্থসামাজিক ফাণ্ডে সম্পদে রূপান্তরিত করার ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যায় মহাভারত রূপক চরিত্র দুর্যোধনের মধ্য দিয়ে। কুরুক্ষেত্রে দুর্যোধনের পরাজয়ের পরবর্তীতে দেখা যায় সব আগে স্বর্গে উপস্থিত দুর্যোধন। অর্থাৎ দুর্যোধন তখন ধনের আবর্জনারূপ থেকে আর্থসামাজিক সম্পদে রূপ নেয়। আর্থসমাজেও অনুরূপ। ব্যক্তি কুক্ষিতে ধন থাকলে ধন স্তূপের আকার নেয় যা বর্তমান কর্পোরেট সেক্টরগুলি।

শ্রমবিজ্ঞানে আর্থসামাজিক ও আমিত্ব বিকাশের জন্য উৎপাদিত মূল্যকে বিভাজিত করা এবং বিভাজনী বাস্তবতায় সেই মূল্যের বিকেন্দ্রীকরণ করতে হয়। বিভাজিত মূল্যকে বিকেন্দ্রীকরণের জন্যই তত্ত্বাবধায়ক ফাণ্ড গঠন।

উল্লেখ্য যে, উৎপাদিত মূল্যের আর্থসামাজিক ট্রাষ্টে অর্পণ এমনি এমনি হয় না। তা করতে হলে শ্রমিকের নৈর্ব্যক্তিক চেতনা-বিকাশের চর্চা করা প্রয়োজন। যে চর্চায় প্রতিটি ব্যক্তিগণ নিম্ন চেতনা থেকে জন ও রণচেতনায় নিজেকে উত্তীর্ণ করে। আর আর্থসামাজিক ট্রাষ্টের ক্ষমতা প্রতিনিধি নির্বাচনে বাস্তবানুগ নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করে। যে কর্তৃত্ব অবশ্যই আবশ্যিক ও উদবৃত্ত মূল্য ব্যবস্থাপনে self ও social audit প্রযুক্তি নিয়েই অগ্রসর হয়।

মহাস্রষ্টা মানুষকে সৃষ্টি করেছে চেতনার অতল তলে, তাই মানব সত্তা নেগেশনে ভরা থাকে। আমিত্ব সর্বদাই আনন্দ বা শান্তিকে আকর্ষণ করে। ব্যক্তি নেগেশন নিয়ন্ত্রণ করলে অনুভূতির শক্তি বাড়ে, শুভ-অশুভের ফারাক করতে পারে। আমিত্বিক শক্তি বাড়ে। পুরানোকে তখন আঁকড়ে থাকার প্রশ্ন থাকে না, নতুন সৃষ্টির মাদোল বেজে ওঠে আর্থসমাজ চরিত্রের মধ্য থেকে।

মানবদেহে অস্তি বা আমিত্বই আবশ্যিক বা উদবৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে। আর দেহের রক্ষ বা নাস্তি শক্তি সেই উদবৃত্ত মূল্য দখল করে নেয়। আমিত্ব চেতনিক দেহমন আবশ্যিকেই নিজেকে সীমাবন্ধ রেখে উদবৃত্তের বিন্যাস ঘটায়। কিন্তু দেহমন আমিত্ব চেতনিক না হলে রক্ষের কবলে পড়ে ব্যক্তিসত্তা নিম্নগামী হতে থাকে। গোটা আর্থসমাজ সত্তার স্বরূপটি তখন কিষ্কিন্ধ্যায় রূপ নেয়। আর্থসমাজে থাকে না ন্যায় অন্যায় বোধ। যে যত পারে আবশ্যিক সহ উদবৃত্তকেও চুরি করতে শুরু করে। আর্থসমাজ তখন গতিহীন। গতিহীন আর্থসমাজ থেকে তখন গ্যাজলা বেরিয়ে আসে। শিক্ষাক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্র, চিকিৎসা ক্ষেত্র, যানবাহন সকলটাই কখন কোন চোরাগলিতে রক্ষের হাতে বন্দি হয়ে যায়। গণমানুষ তা বুঝতে পারে না। আর্তনাদ শুনতে পাওয়া যায় মানবজাতির। কিন্তু রক্ষ নানা সেন্টিমেন্ট খাড়া করে। তার মধ্যে অতীন্দ্রীয় জগৎ, যে জগৎ সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট ধারনা মানুষের নেই। সেই দিকেই মানুষকে আকৃষ্ট করে দেয়। কারণ রক্ষণকাম মানসিকতায় উচিৎ অনুচিত বোধ শূন্য হয়ে যায়। এই কারণেই মহাভায্যের নির্দেশ, 'আমি তাদের চোখ দিয়েছি, চোখ দিয়ে তারা দেখে না, কান দিয়েছি কান দিয়ে তারা শ্রবণ করে না এবং হৃদয় দিয়েছি যা দিয়ে তারা অনুভব করতে পারেনা। তারা হৃদয়ে মোহর মেরে নিয়েছে।'

ব্যক্তি নিজ সচেতনায় নিজেকে জিজ্ঞাসা করেই গবেষণা করে সুখ বা আনন্দ আকর্ষণের। এই নিজেকে জিজ্ঞাসা করা মানেই গো এর এষণা বা গবেষণা। যে গবেষণায় নিজের সত্তায় থাকা নেগেশনকে নিয়ন্ত্রণ করে উন্নত (সংস্কার) সংস্করণে নিজেক নিয়ে যাওয়ার সাংস্কৃতিক চর্চা। এই সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্য দিয়ে প্রশস্ত হয় সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি যা মানবতার বিকাশের পথকে সুগম করে। যা মহাভারতে কথিত রূপকের মধ্য দিয়ে স্বশরীরে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গ লাভ।

নিজ সত্তায় থাকা নেগেশনকে নিয়ন্ত্রণ করেই নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারাই হল নিজেকে দেখা। এখান থেকে শুরু হয় সমাজসত্তার দিকটি। যতক্ষণ নাস্তি নিয়ন্ত্রণ ততক্ষণই আমিত্ব বিকাশ হয়। এর বিপরীতে দেখতে পাই নিজের নিয়ন্ত্রণহীনতার ফল স্বরূপ নানা দূর্ভোগ।

ব্যক্তি উদ্যোগে নিজেকে সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্য দিয়ে আমিত্বানুশীলন করে যাওয়া। আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ, তার জন্য প্রয়োজন সাংস্কৃতিক মঞ্চ গঠনের। যেখানে আলোচনা হবে পরবর্তী অধ্যায় রচনার যা অবশ্যই 'অস্তিত্ব' দর্শনের দর্পনে দেখানো জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রাম প্রযুক্তির মধ্য দিয়ে।

গল্প

বেস্ট কাপল

তানিয়া খাতুন

প্রায় দশ মিনিট ধরে অদৃজা এই ঝাঁ চকচকে ফ্ল্যাটটিতে বসে আছে। ঢুকতেই বিশাল ড্রয়িং রুম, মাথার উপর ইয়া বড় ঝাড়বাতি, ৪০ ইঞ্চির এলিডি, ফ্রিজ, বাঁদিকের ওয়ালটার পুরোটা জুড়ে ফ্রেমে বাঁধানো কাঁচের ভেতর দেশ বিদেশের বই। মিন্টো পার্কের মতো জায়গায় এরকম সুন্দর ২বিএইচকে কারই না পছন্দ হবে। এই পুরো ফ্ল্যাটটিতে জিনিয়া একাই থাকে। জিনিয়া অদৃজার কলিগ, প্রায় ৬মাসের বন্ধুত্ব ওদের। জিনিয়া ওর নতুন ফ্ল্যাটে আসার জন্য অদৃজাকে প্রায়-ই বলত। আসব আসছি করে আসাই হয় না। আজ তাড়াতাড়ি অফিস ছুটি হয়ে গেল, ব্যাস-চলে এলো। জিনিয়ার ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপের স্ট্যাটাস দেখে অদৃজা আঁচ করতে পেরেছিলো, ফ্ল্যাটটি বাহারি রকমেরই হবে।

— কী মশাই! কী এতো ভাবছেন? পতিদেবের কথা?

— আরে না না।

— যাই বলিস, তুই কিন্তু খুব লাকি। আর তোর বর কী হ্যান্ডসাম।

— মুখে আলতো হাসি রেখে অদৃজা কফিতে চুমুক দিলো।

— বল ডিনারে কি খাবি?

— না রে, আমি উঠব। ডিনারটা আমি ওর সঙ্গেই করায় চেষ্টা করি। সারাদিনতো নিজেরা ব্যস্ত থাকি।

— বাব্বা। এতো প্রেম? এক্কেরে মেড ফর ইচ আদার। বেস্ট কাপল তোরা। কিন্তু এই রকম গদগদ প্রেম আমার দ্বারা হবে না। তা তুই পিকনিকে যাচ্ছিস তো?

— দেখি।

— দেখি মানে? তোরা ম্যারেড মহিলারা এতো ন্যাকাষস্টি হোস কেন রে? নিজেরা একা চলতে পারিস না? হাবির কথায় উঠিস বসিস।

— অদৃজা চুপ থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, জিনিয়া আমি ভালো নেই। এই জীবনটাকে কেমন যেন দম বন্ধকর মনে হয়। কিন্তু ওই যে বললি, আমরা বেস্ট কাপল। বেরিয়ে আসতেও পারছিনা।

— হোয়াট? কী বলছিস এসব?

— না রে। কিছু না। যাই হোক, তোর ফ্ল্যাটটা ভারি সুন্দর।

— Thank you dear. But you are avoiding me about your problem.

বাসটা ফাঁকাই আছে। সাবধানে উঠে সামনের দিকে একটা সিটে বসল অদৃজা। শাড়ি পরে বাসে উঠতে নামতে খুব ভয় করে অদৃজার। এই বুঝি পড়ে গেল। এগুলো কে বোঝাবে হিমাদ্রিকে। ওর ওই এক কথা, 'শাড়িতে নারী সুন্দর', মা মাসিদের উদাহরণ তুলে আনবে। এইসব শোনার চেয়ে শাড়ি পরাই ভালো।

বছর দু'য়েক আগে অদৃজা-হিমাদ্রি ভালোবেসে বিয়ে করেছিল। চালচুলোহীন হিমাদ্রির প্রেমে পড়েছিল অদৃজা। পাগলাটে, খামখেয়ালি, আধা কবি হিমাদ্রি প্রেমিকই ভালো ছিল। হিমাদ্রির ভালোলাগা মন্দলাগা গুলোকে আপন করে নিতে চেয়েছিল। হিমাদ্রিকে আরো কাছ থেকে ভালোবাসতে পারার আশায়। কিন্তু ইদানিং অদৃজা কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে গেছে। হিমাদ্রির উদাসীনতা আর ওর সহ্য হয় না। জীবনে কোনো অ্যামবিশন নেই, কোনো সিকিউরিটি নেই। এইরকম একটা আনসেফ লাইফে অদৃজা নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। বাঘা যতীন এসে গেছে, অদৃজা এবার নামবে।

অদৃজা হিমাদ্রিকে তাড়াতাড়ি ফেরার জন্য একটা মেসেজ দিয়ে রেখেছে। তার রিপ্লাই এখনও আসেনি। সবকিছুতেই হিমাদ্রির উদাসীনতা। সাড়ে এগারোটা বাজে। অদৃজা একাই খেয়ে নিলো। দু'দিন পর

পিকনিক আছে। যাওয়ার ব্যাপারে হিমাদ্রি হ্যাঁ-না কিছুই বলেনি। আজ তাড়াতাড়ি ফিরলে ফাইনাল কথা বলা যেত।

টাইমটা দেখার জন্য পকেট থেকে মোবাইলটা বের করল হিমাদ্রি। ইস। অনেক বেজে গেছে। অদৃ-র মেসেজটার রিপ্লাইও দেওয়া হয়নি। ভেবেছিল তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে সারপ্রাইজ দেবে। কিন্তু...

অদৃজা ঘুমিয়ে পড়েছে। হিমাদ্রি ঘুমন্ত অদৃজার কোমরে হাত রাখল। বোঝার চেষ্টা করছে জিন্সের সাইজটা ঠিক হবে কিনা। ওয়েস্টার্ন ড্রেস অদৃজার খুব পছন্দের। দু'দিন পরেই ওর অফিসের পিকনিক। কাল সকালে যখন হিমাদ্রি অদৃজাকে জিন্স-শার্টটি দেবে তখন অদৃজা নিশ্চয় খুব খুশি হবে। অদৃজার আনন্দে ভরা মুখটা কল্পনা করে হিমাদ্রি অদৃজাকে জড়িয়ে ধরল।

অদৃজা বিরক্তির স্বরে বলল, আহ! ছাড়ো, কাল অফিস আছে।

সকালবেলা অদৃজা হিমাদ্রির লেখার টেবিলের পাশে দাড়িয়ে বলল, তোমার সাথে কিছু কথা ছিল। হিমাদ্রি লেখা থেকে মাথা না তুলেই বলল, —হ্যাঁ, বলো।

—কাল জিনিয়ার ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম। পজিশন ভালো, সস্তাও।

—হুম।

—তোমার প্রমোশনটার কী হলো?

—খোঁজ নিই নি।

—খোঁজ নাও নি মানে? সারাজীবন কী এভাবেই গরু-ছাগলের মতো কাটাবে ভেবেছ?

—অদৃ! কী বলছো এসব? আমাদের কীসের অভাব? বেশ তো আছি।

—তোমার এই বস্তাপচা লেখা ক'জন পড়ে বলতো? ক'টা লোক হিমাদ্রি সেনকে চেনে? কবি হিমাদ্রি সেন।

—অদ্ভুত! তোমার সমস্যা কোথায়? এই বাড়িতে থাকতে? নাকি আমার লেখায়?

—সবকিছুই। তুমি লোকটাই অসহ্যকর। Just irritating!

—শান্ত হও। যাও একটা সাওয়ার নিয়ে নাও।

—না, যাব না। শুরুর দিকের মিষ্টি প্রেম স্বাদ বদলে কেমন বিষাক্ত হয়ে গেছে তুমি বোঝ না?

—অদৃ, তুমি বাচ্চাটিই বেশ ছিলে। সংসার ধর্ম তোমাকে জটিল করে দিয়েছে।

—এসব শিশু ভোলানো কথা বলে সত্যিটাকে এড়িয়ে যেও না। তুমি নিজেও জানো, আমাদের মধ্যে আর কিছু বেঁচে নেই। সো, লিভ মি।

হিমাদ্রি চুপ হয়ে গেছে। কী বলবে ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না কবে এতো ফাটল ধরল। সেদিনের সেই প্রাণখোলা মিষ্টি অদৃকে সে চিনতে পারছে না। তবে কী পার্থিব মোহের আবরণে ওদের ভালোবাসা চাপা পড়ে গেছে।

সকালের ঘটনার পর অদৃজা জিনিয়ার ফ্ল্যাটে ওঠে। ওর কাছে একদিন থেকে পরের দিন একসাথে পিকনিকে যাবে। এই দু'টো দিন নিজের মতো থাকবে।

হিমাদ্রির জন্য পুষে রাখা রাগ-ক্ষোভ-অভিমান সবকিছু অদৃজা জিনিয়াকে বলেছে। হিমাদ্রির জীবনে কোনো অ্যাম্বিশন নেই শুনে জিনিয়া বলেছিল, 'দেখ সবার জীবনেই সুখ-দুঃখ আছে। কিন্তু আমার একটা পলিসি আছে, জীবনে দুঃখ আসবে আসুক কিন্তু ভাই আমি কাঁদতে হলে এসি রুমে আরাম করে বসেই কাঁদবো।' খুব হেসেছিল অদৃজা। জিনিয়ার কথা মতো ও নিজেকে সময় দিতে চাচ্ছে কয়েকটা দিন, সম্পর্কটা আর ওয়ার্ক করবে কিনা ভেবে দেখতে।

ভোর বেলা শিয়ালদহ স্টেশনের ওয়েটিং রুমে অদৃজা বসে আছে। পিকনিকটা কৃষ্ণনগরে। জিনিয়া অন্যদের সঙ্গে ওদিকটায় সেলফি তুলতে ব্যস্ত। ট্রেন আসতে কিছুক্ষণ দেরি আছে। অদৃজা ওয়েটিং রুমের মানুষগুলোকে লক্ষ্য করতে শুরু করল। বসে থাকা মানুষগুলো সবাই ট্রেনের অপেক্ষায়। সাত সকালে চড়া মেকাপে একটি মেয়ে বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে ছবি তুলছে। এরা হয়তো অনলাইন সেলিব্রিটি। নিশ্চয় 'বেস্ট কাপলের' খেতাবটা সোসাল মিডিয়া দিয়ে ফেলেছে ওদের। একেকজন এক-এক রকম কাজে ব্যস্ত, এদের চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখলে কয়েকঘন্টা এমনিই কেটে যাবে।

এরপর অদৃজার চোখ মেঝেতে শুয়ে থাকা মানুষগুলোর দিকে গেল, বুকটা কেমন যেন কেঁপে উঠল। হঠাৎ জিনিয়ার ফ্ল্যাটটি চোখের সামনে ভেসে উঠল। এরা শীতের দিনে মেঝেতে একটা চট পেতে পাতলা চাদরে রাত পার করছে। লেপের তলে পাশ ফিরে ফিরে শোয়ার উষ্ণ আরামটুকু এরা কখনই ভোগ করতে পারেনা। অদৃজার মনটা ভিজে এলো। সামনেই বাঁদিকের কোণাটায় স্বামী-স্ত্রী দু'জন একটা পাতলা কম্বলের তলে শুয়ে আছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ওরা চুমু খাচ্ছে! অদৃজা একটু লজ্জা পেল। ওই দম্পতির কাছে ঐ কম্বলের তলাটুকুই ওদের গোটা পৃথিবী। সেই পৃথিবী দেখার কোনো অধিকার তার নেই। ওরা বাইরের পৃথিবীকে অস্বীকার করে ওখানে নিজেদের স্বপ্নগুলো সাজাচ্ছে। অদৃজা নিজেকে সান্ত্বনা দিতে ভাবল, ওদের বয়স নিশ্চয় কম, আর তাছাড়া শরীরতো কাউকে ছেড়ে দেয় না। ক'টা দিন যাক, তারপর...

—কী রে। ওঠ, অ্যানাউন্স হয়ে গেছে। চল, চল। জিনিয়া অদৃজার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল।

জলের বোতলটা ফেলে রাখায় অদৃজা দৌড়ে আবার ওয়েটিং রুমে এল। এই ফাঁকেই ইচ্ছে হল ঐ দম্পতিকে আরেকবার দেখার। মুখটা যদি দেখতে পায়। অদৃজা তাকালো, অবাক হয়ে গেল। মহিলার সব চুল সাদা। পাশে বরটি তখনও কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। ওই মহিলা কুচকে যাওয়া মুখ, ঘোলাটে চোখে অদৃজার দিকে চেয়ে দাঁত বের করে হাসল। অদৃজা বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'বেস্ট কাপল'।

ভোর
সুকৃতি

প্রত্যুষা ঘরে নেই। অগত্যা সূর্যোদয়ের আগে অদিতিই বিছান ছেড়ে উঠে পড়ল।

ঘন সবুজের সমারোহ আর আকাশের সাদা কাশফুলের আভার আলো আধারিতে লুকোচুরির খেলা চলছে...উঠি উঠি করে সূর্যদেব একটু বেশ আলোর মুখে এসে পড়ল — চাদরটাকে আর একটু মুখের কাছে টেনে নিয়ে বলল — এই শুভ জানালাটা একটু ভেজিয়ে দেনা, বাবা।

দুটো পাল্লার মাঝে একটু ফাঁক রেখে শুভ সুর করে পড়তে শুরু করলো —

''পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল,
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।''

মৃদুস্বরে সুরেশ বলল, একটু আস্তে। এবারে দুষ্টু ছেলে, আরও একটু গলার স্বর উঁচু করেই আরম্ভ করলো —

'Early to bed, early to rise.'

— (আদর করে) একটু আস্তে, এত চেঁচাও কেন?

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে দ্রুতপদে ঘরে ঢুকল অদিতি।

অদিতি — ওঠ তোমার চা নিয়ে এসেছি। অদিতি একটু কাছে এসেই দাঁড়াল। ধড়মড় করে চাদরটা গা থেকে সরাতে গেল সুরেশ। চাদররে কাপটায় অদিতির হাত থেকে কাপটা দুম করে গেল নীচে পড়ে। হতবুদ্ধির ন্যায় দাড়িয়ে অদিতি। বিরক্ত হয়ে সুরেশ বলল — কাজকর্ম নেই বলে আজ একটু ঘুমোচ্ছিলম, আর তোমরা দুটিতে মিলে দিলে তো সব পণ্ড করে। অদিতির মুখটা এত সকালেও বেশ ক্লান্ত, পাংশুমুখে একটু মিষ্টি হেসে বললে, — আসলে অনেকদিন পর চা করেছি তো, তাই তোমাকে... মুখের কথা না ফুরোতেই সুরেশ অত্যন্ত রেগে উঁচু গলায় খেঁকিয়ে উঠল, — তোমার এই শরীরে কেন? প্রত্যুষা কই? প্রত্যুষার কথা কানে যেতেই শুভ হঠাৎ ওদিক থেকে বলে উঠল — বাবা, মাসি তো তোমার লাইব্রেরি রুমে বই গোছাচ্ছিল আর কাঁদছিল। সুরেশ মনে মনে ভীত হয়ে উঠল। আহত হয়ে, অদিতির মুখের দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে বলল — তুমি কি কিছু বলেছ তাকে?

অদিতি (আর্দ্রস্বরে) — না, আমি ওকে ঠিক আসতে বারণ করিনি। জেঠুর শরীরটা কয়েকদিন থেকে ভালো যাচ্ছে না, মাঝে মধ্যেই শ্বাসকষ্ট, তাই বলেছি ওখানে সেরকম হলে যেন না আসে।

প্রত্যুষার পাঁচকুলে কেউ নেই। আটবছর বয়সে শুভদের বাড়ির সামনে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পথে কারোর সাইকেলের সাথে ধাক্কা লেগে প্রত্যুষার হাতের কব্জির হাড় যায় মচকে।

তৎক্ষণাৎ রাস্তা থেকে তুলে এনে শুশ্রূষা করে অদিতিই। সে আরও জানতে পারে জন্মের পর থেকেই প্রত্যুষা মা হারা। একটা অসম্ভব মায়া ভিড় করে আসে অদিতির হৃদয়জুড়ে। তারপরের কাহিনি আরও ভয়ানক। আর এখান থেকেই প্রত্যুষা বোন হয়ে ওঠে অদিতির।

প্রত্যুষাকে পাবার দু'বছর পরেই অন্তঃস্বত্তা হয় অদিতি। শুভর জন্মের সময় অদিতির দেহের বামপাশ অনেকাংশে অসাড় হয়ে পড়ে। ডাক্তারের পরামর্শ ছিল — ব্যায়াম নিয়মমাফিক। মা-হারা প্রত্যুষা ছোটতেই কীভাবে বড় হয়ে উঠল, আস্তে আস্তে সুরেশ-অদিতির সংসার কাজকর্মে প্রত্যুষার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল।

স্বভাবতই আজ প্রত্যুষার জায়গায় অদিতিকে দেখে একটু

ভীত হয়ে পড়েছিল সুরেশ, অদিতি এখনও অনেকটাই দুর্বল, ফর্সা, গোলাকার সুশ্রী মুখমণ্ডলের চোখ দুটোর নীচে এখনও কালি রয়েছে। মাঝারি উচ্চতা। অদিতি ভালোভাবে বেশীক্ষণ হাঁটাচলা করতে পারেনা।

পেশায় সুরেশ অত্যন্ত দক্ষ টেলার। তার আণ্ডারে বেশ কয়েজন কর্মচারী রয়েছে। রোজগার ভালো রকম। আর এলাকার যুবকদের নিয়ে গড়া 'যুব সংগঠনের' প্রথম সারির সদস্য।

শার্টার বন্ধ করে সুরেশ আজ একটু তাড়াতাড়িই বাড়ি ফিরল। ঘরে ঢুকতেই দেখল, অদিতি কেমন এলোচুলে ঘুমিয়ে পড়েছে। চাদরটা টেনে দিয়ে মুখের চুলগুলো আলতো করে সরিয়ে দিতে দিতে, নম্রস্বরে বলল— সকালে রেগে গেছিলাম, আসলে কাজকর্ম করার মত অবস্থায় তো তুমি নেই, না। অদিতির নরম হাতটা, সুরেশের হাতটাকে ভালোবাসা দিয়ে আঁকড়ে ধরল।

পরের দিন। রাত ৮টা ৩০মিনিটে সুরেশ ডিনারে।

অদিতি— প্রত্যুষা মনে হয় আর রেগুলার আসতে পারবেনা। আমিও জোর করছি না। দুপুরে ফোনে কথা বললাম। জেঠুর শ্বাস কষ্টটা বেজায় বেড়েছে।

সুরেশ— (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) ওর মাধ্যমিকের পড়াশোনাটার খুব ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে।

অদিতি— হাঁ, তাতো হচ্ছেই। শুভটা খালি মাসি মাসি করছে।

সুরেশ—(হেসে) না করাটাই তো অস্বাভাবিক তাই না? দেখ শুভ তো ওর কোলেই বড় হল, অ আ , A B C D যে ও শিখেছে, তার মাস্টারটিও তো সেই মাসিই। (একটু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) মাঝে মধ্যে টেলারিং এর কাজটাও একটু আধটু শিখছিল..। ওর হাতের বোনা উলের পোশাকগুলোও খুব সুন্দর হয়।

এভাবেই প্রায় বিশদিন মতো কেটে গেল। বারান্দার অপরাজিতা আর রজনীগন্ধার পুষ্পে সৌরভে সুবাসিত হয় এই ছোট্ট বাড়িটি প্রতি সন্ধ্যায়। আজও তার ব্যতিক্রম নেই। শুধু বাড়ির পুচকেটার সাথে ষোল বছরের বালিকার হাল্কা কথায় খিলিখিলি হাসিটি কোথায় হারিয়ে গেছে... বিছানা..বারান্দা উঠোনে শুভ গাড়ি চালায়, পুরোনো খাতার পাতা ছিড়ে কুটি কুটি করে.. মজা পায়। সুরেশেরও হয়েছে আর এক দশা। অদিতির একটা কাজ সুরেশের পছন্দ হল তো, অন্য ব্যাপারের সে সুরেশের থেকে তিরস্কৃত হয়।

সে তার টেলারিং-এর দোকানে সেই এগারোটা বারোটায় চলে যায়, রাত্রে ফেরে। সারাদিনের মাঝে মাঝেই সঙ্গা শূন্যতায় অদিতির মনটা হাহাকার করে ওঠে।

সেদিন সুরেশ একটু বেশিই তাড়াহুড়ো করছিল। হ্যাঙ্গারের কোন শার্টই সুরেশের পছন্দ হল না, এক-একটা করে সব ছুড়ে দিল মেঝেতে। দ্রুত পদে ছুটে এসে আলমারি থেকে অদিতি একটা সুন্দর শার্ট সুরেশের হাতে দিতেই সুরেশ ক্রুদ্ধ হয়ে চিৎকার করে উঠল—এটা হয়েছে? এর কিছুই ইস্ত্রি হয়নি। আজ তো আমার মিটিং আছে, তুমি জানতে তো?

অদিতি বেশ জোরের সাথে জবাব দিল—কিন্তু ওটা তো গত রাতেই আমি ইস্ত্রি করলাম।

অদিতির গলার এই তীব্রভার সুরেশের আর সহ্য হল না, সে গলা ফাটিয়ে দুম করে বলে বসল—প্রত্যুষার কারণেই তোমার এই অকর্মণ্যতা। তবু তুমি নিজের ত্রুটি স্বীকার করোনা। এখন আমার কোন জিনিসের ঠিক নেই। কিছু জিনিস তুমি গুছিয়ে রাখতে জাননা? নিতান্ত বালকের ন্যায় এদিক ওদিক ইতস্তত করতে করতে সুরেশ যেন, কিছু খুঁজছে তবু পাচ্ছেনা, আর দ্রুতগতিতে বাক্যবাণ অদিতির প্রতি নিক্ষিপ্ত হচ্ছে অবিশ্রান্ত ধারায়। অদিতি অপরাধীর ন্যায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে। বিবর্ণ ফ্যাকাসে মুখ। সুরেশ হনহন করে অদিতির দিকে না তাকিয়েই ঝড়ের মত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ঘর থেকেই অদিতি শুনতে পেল, প্রত্যুষার গলা— একটু দিদির সাথে কথা বলে আসছি।

সুরেশ — না, এসে বোলো। এখন এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে।

অদিতি ছুটে বেরিয়ে এল, ততক্ষণে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। নিস্তব্ধ হয়ে দাড়িয়ে রইল, একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল, মনে মনে বলল, মিছিমিছি মানুষটা এমন করছে কেন? প্রত্যুষাই বা কেন জোর করে দেখা করল না আমার সাথে? হয়তো সময় ছিল না সত্যই। প্রত্যুষা একটু নম্রভাষী সে জানত। তবু আশা আকাঙ্খার এমন উগ্র প্রতিচ্ছবি! অবাক হল। আপাদমস্তকের মধ্য দিয়ে হু হু বাতাস। তার কাজকর্মের নিপুণতা বা নিজের গুরুত্ব.. ওই একরত্তি মেয়েটার সাথে তুলনা কোনওভাবেই মানতে পারলনা, একটা অস্থিরতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। শুভও চলে গেছে স্কুলে। বাড়ির সামনে রাস্তার ধার বরাবর তারের বেড়া। তার ভেতরে অদিতির কিছু ফুলের গাছ। কাজের মধ্যে থাকলে ভালো লাগতে পারে, তাই সে ভাবল, গাছগুলোর একটু যত্ন নেওয়া যাক। গাছগুলোয় মাথা নুইয়ে জল দিচ্ছিল। হঠাৎই কে যেন বলছে, — বৌমা যে! অদিতি চমকে উঠল। ঠোঁটে একটু হাসি টেনে বলল — ওহ, কাকীমা। ভালো তো।

— তোমরা দুটিকে একসাথে দেখলে মন জুড়িয়ে যায়। অদিতি এবারে অবাক হল।

— তো বৌমা, এই তো আধঘন্টাও হল না, চলে এলে? কোথায় গেছিলে গো?

অদিতি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। মুখের কথা মুখেই থাকল — উনি বলে চলেছে — তোমরা দুটিতে বেশ মানায়। অনেকদিন পর খুব ভালো লাগল।

অদিতির মুখ এবারে ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। নিজেকে সামনে নিয়ে বলল — ওহ, ওতো প্রত্যুষা, আমার বোন ছিল। নিজের এই অস্বস্তি অদিতির কাছে অদ্ভুত আর অপ্রত্যাশিত ঠেকল, নিজেকে নিজের কাছে ছোট মনে হল। মুখ তুলে তাকাতে পারল না। গাছে জল দিতে লাগল। জেঠিমা মুখ ফেরালেন, একটি বাঁকা হাসির রেখা ঠোঁটের কোণে খেলে গেল, অদিতির তা চক্ষুগোচর হল না।

অদিতির ফাঁকা মনে কথাদের তরঙ্গ বাজছে, সকালে সুরেশের কথা আর জেঠিমার কথার মিল খুঁজে চলেছে..। স্নান সেরে, বিছানায় গা এলাতে গিয়ে কানের পাশে অকস্মাৎ কে যেন বলে গেল, — দুটিতে বেশ মানিয়েছিল।

সন্ধ্যা হয়ে এল। অপরাজিতার সুবাস কে যেন কেড়ে নিয়েছে। সবসময় একটা রিরি শব্দে কান ঝালাপালা করছে, বাতাসে ধোঁয়াশা, ঘরে অদিতির দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। বিছানা ছেড়ে বারান্দায় এল।

হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল, — প্রত্যুষার ফোন। ওর বাবার চরম শ্বাসকষ্ট, দিদির কাছে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। প্রত্যুষার দুখী হৃদয়ের কান্না, দিদি ডাক অদিতিকে আবেগে তোলপাড় করে তুলল, পুরো দিনটা তার কাছে মিথ্যে প্রতিভাত হল। সুরেশ অদিতি সে রাতেই ডাক্তারসমেত প্রত্যুষার বাড়ি উপস্থিত হল। পরেরদিন, তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন।

ইতিমধ্যে কয়েকদিন কেটে গেছে। বিভিন্ন ব্যাপারে সুরেশের মুখে প্রত্যুষার প্রশংসার পাশাপাশি অদিতির প্রতি মাঝে মাঝেই ভীষণ রেগে যাওয়া অদিতির কাছে বিস্ময়কর আর নতুন মনে হতে লাগল।

সেদিন রাতে সুরেশ ঘরে ফিরেই উন্মাদের মত বলে চলেছে — প্রত্যুষা যদি না থাকত তাহলে, বাচ্চাদের ফ্রকের এই নতুন স্টাইলটা আমি বাজারে আনতেই পারতাম না। এতে কত প্রফিট আছে তোমার আইডিয়া আছে। ওর নিজস্বতা আছে, একটি ক্রিয়েটিং পাওয়ার আছে, ওর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

অদিতি লক্ষ্য করল, তার শরীরের প্রতি সুরেশের কোনও খেয়াল নেই। ভেতরে ভেতরে সে খুব কষ্ট

পেল।

সুরেশ কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত ন'টায় বাজেনি, অদিতির ঘুম আসছিল না। সুরেশের ফোনটা নিয়ে সে নাড়াচাড়া শুরু করল। কল লগে সে দেখতে পেল— প্রত্যুষার সঙ্গো তার প্রতিদিন দু-তিনবার করে কথা হয়। টেক্স-এর সংখ্যাও কম নয়। সন্ধ্যা সাতটার পরের একটা এসএমএস দেখল, তাতে লেখা আছে, —যদি দরকার হয় রাতে ফোন করো।

অদিতির মাথা খারাপ হওয়ার যোগাড় হল। সুরেশের দিকে তাকিয়ে অদিতি ভাবল, 'এত নিষ্পাপ শিশুসুলভ মুখ।' তারপরেই আবার সে ভাবল, 'দেখ, কেমন দারুণ আমেজে ঘুমোচ্ছে।'

ঘরের লাইট বন্ধ আছে। আকাশপাতাল কি যেন অদিতি ভেবেই চলেছে। হঠাৎ মনে হল, ফোনে আলো। অদিতি দেখল, সত্যিই প্রত্যুষার ফোন। সে ফোনটা রিসিভ করল না। সাইলেন্ট করে দিল। আরও চার..পাঁচবার ফোন বেজে গেল। অদতি একবার ধরল, কিন্তু কিছু কথা বলল না, সুরেশকেও ডাকল না।

সকালবেলা প্রত্যুষার বাবার মৃত্যুর হওয়ার খবরটি একটি ছেলে এসে দিয়ে গেল। সুরেশের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। অদিতি তখন বাইরে ছিল। ফোন চেক করতেই সুরেশ সব বুঝতে পারল। সুরেশ ক্রোধান্বিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল— আমার ফোন কেন তুমি ছুঁয়েছ? যদি ধরেইছ, কথা বলনি কেন?

অদিতি বিড়বিড় করে বলল— সরাক্ষণ ফোনে ফুসুর ফুসুর। তো এখন কথা হলেই তো হয় নাকি?

—না, হয় না।

এই অপকাণ্ড আর অদিতির ব্যঙ্গাত্মক কথায় সুরেশ কিছুতেই নিজেকে সংবরণ করতে পারল না, সপাটে একটা চড় অদিতির গালে কষিয়ে দিল। সে মেঝেতে ছিটকে পড়ল, উন্মত্তের ন্যায় সুরেশ বাড়ি ছেড়ে বেরোল।

এই রুদ্রকণ্ঠ অদিতি আগে কখনও শোনেনি। সে বিহ্বলের মত চেয়ে রইল, তবে ভয়ানক কিছু যে ঘটেছে সে আন্দাজ করতে পারল। সম্বিৎ ফিরে এলে সে এদিক ওদিক থেকে সবই জানতে পারল।

বাবার মৃতদেহের পাশে প্রত্যুষাকে দেখে মনে হচ্ছিল হঠাৎ করে ধেয়ে আসা বিধ্বংসী ঝড়ে কেমন সমস্তটাকে ওলটপালট করে দিয়েছে, সবটুকু গিলে নিয়ে স্বল্পভাষিনী আরও শান্ত হয়ে গেছে। আর কিছু নেই হারাবার— ভাবাতুর হৃদয়ে প্রত্যুষার কাছে এসে সুরেশ বসতেই প্রত্যুষা ডুকরে কেঁদে উঠল।

—রাতে বাবা বলছিল, সুরেশকে ডাক, আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চল। তুমি ছাড়া কে আছে বল। ফোন করলাম। হল না.. তোমাকে না পেয়ে পরেশদার কাছে গেলাম, পরেশদাকে নিয়ে ফিরতেই দেখি বাবা নেই। এলাকায় তুমি ছাড়া আর তো কারও গাড়ি নেই। পরেশদাই যেত, নিজে তোমার কাছে। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে।

প্রত্যুষার চোখের জল সুরেশ সহ্য করতে পারল না। সে কেবলই ভাবছিল— আমিই দোষী। যদি আমি সময়ে আসতে পারতাম, তাহলে ভালো কিছুই ঘটতে পারত।

প্রত্যুষার বাবার সব কাজ সুরেশ সপন্ন করল।

আজ সাতদিন হল— সুরেশ অদিতিতে একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে। সেই আগের মত ছেলের কথা নিয়ে হাসি মজা হয় না, দুখের কথা বালাই সাট। অদিতির মনে কোনো স্থিরতা নেই, রাতে ঘুম নেই। চোখের নিচে কালি জমেছে। সে নিজেকে নানা দিক থেকে বিশ্লেষণ করে দেখতে থাকে। শেষে নিজের প্রতি ধিক্কারের তার মন বিষণ্ণতায় ভরে গেল। সুরেশের দিকে পাশ ফিরে তার মুখের দিকে তাকাল। মানুষটির সবটুকুই সে জানে। ধীরে ধীরে হাতটি তার কপালে বুলিয়ে দিল। সুরেশ তার দিকে ঘেঁষে এল।

তখন ভোর হয়ে এসেছে। পূব আকাশে রঙের আভা।

তাসের ঘর

বৈশালী রায়চৌধুরী

দু তিনবার অধৈর্য্য হাতে ডোরবেল বাজানো এ তো একজেনরই কাজ, কোলাপসিবল খুলে দিতেই ঝড়ের বেগে ঘরে ঢোকে সর্বাণী। এসেই বলে, 'বউদি খেতে দাও'। স্নান করতে যাব যাব ভাবছিলাম, ভাতের থালা আর তরি তারকারি এনে ডাইনিং এর মেঝেতে দিই। সর্বাণী তার বরাদ্দ আসনখানা এনে দ্রুত খেতে শুরু করে। পুজোর ঘর থেকে শ্বাশুড়ীর চিৎকার ভেসে আসে, 'কি চার চারদিন রোজ তোর দেরি! একদিনও কি ঠিক সময়ে আসবি না।' সর্বাণী কখনও রাগে না, সদাহাস্যে বলে, 'কি করব মামী, ছেলেদের রান্না করে, টিফিন গুছিয়ে আসতে দেরি হয়ে যায়। খাবার সময় পাই না তো, তাই তোমাদের বাড়ি এসে এসেই খাই। তোমার জামাই নতুন লেপ কিনেছে গো মামী। তোমাদের বাড়ির থেকেও মোটামোটা। ঘুম ছেড়ে তাড়াতাড়ি বেরোতেও পারছি না ছাই।' বলে তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিজের কাজ গোছাতে থাকে সর্বাণী। সঙ্গো সঙ্গো চলে তার অনর্গল বকবকানি। স্নান সেরে স্কুলের জন্য রেডি হতে হতে বলি, 'হ্যাঁ রে স্কুলের মিড ডে মিল খায়না ছেলেরা? খেতে পারে তো? কত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রান্না হয়।' 'কি যে বল বৌদি, আমার ছেলেরা খাবে মিড ডে মিল? সরু চাল ছাড়া মুখে দেয় না, সঙ্গো মাছ তো লাগবেই। সত্যি কথা বলতে কি বৌদি আমার এত কাজ না করলেও চলে। সারাদিন বর ছেলেদের এত প্যাখনা। ছেলেরা স্কুলে চলে যায়। বাড়িতে ভাল লাগে না তাই এই তিন বাড়ির কাজ। গল্পগাছা করি, ভাল লাগে, এই আর কি।'

এই হচ্ছে আমাদের সর্বাণী। ভাঙে তো মচকায় না। স্বভাব জানি তাই আর কথা না বাড়িয়ে তৈরি হতে শুরু করলাম স্কুলের জন্য।

সর্বাণীর মা অসীমাও এ বাড়ির ঠিকে লোক ছিল। সর্বাণী নামটা আমার শ্বাশুড়িরই দেওয়া, দূর্গা পুজোর সময় জন্ম বলে। সেভেন এইট অবধি সর্বাণীর পড়াশোনা, তারপর ষোল সতেরোতেই বিয়ে। এই মোটামুটি সর্বাণীর ইতিহাস। অবশ্য বিয়ের পর পরই স্বামী স্ত্রী কৃষ্ণনগরে পাড়ি দিল কারণ নাকি গেঞ্জি কারখানায় মোটা মাইনের চাকরি পেয়েছে সর্বাণীর স্বামী। কিছুকাল পর আবার বহরমপুরে ফিরল তার সঙ্গো তিনটে বাচ্চা। কেন? না কৃষ্ণনগরে অঢেল সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও বাড়ির জন্য, এ শহরের জন্য, ওদের মনখারাপ করত, তাই ফিরল। তাছাড়া 'ঘর তো ঘরই।' যাক গে যাক, আমরাও তো ভাবি East or west home is the best এ ভাবেই নিলাম।

সে যাই হোক অসীমার শরীরে আর তেমন জোর নেই তাই বহাল হল সর্বাণী। কিন্তু এর যে কত ফ্যাকড়া আর বায়নাক্কা তার শেষ নেই, 'বউদি দশ হাজার টাকা দাও, ভীষণ দরকার। মাসে মাসে শোধ করে দেব।' জোরাজুরিতে দিলাম সে টাকা, শোধ করে দিল ঠিকঠাক। দরকার টা কী? না পাশের বাড়িতে ছেলেকে পছন্দের কার্টুন চালিয়ে দেয়নি, ওর টিভিটা কেনা খুব দরকার ছিল, তাই-ই কিনেছে। আমাদের বাড়িতে কিছুদিন আগেই পুরানো টিভি সারিয়ে নতুন এলইডি এল তাই দেখে সর্বাণীর কি খুঁতখুঁতুনি। ইস, বৌদি, 'কি যে ঢপ কিনলাম, আমার বুদ্ধিটাই কম। এই টিভি হলেই আমাদের সুবিধে ইত্যাদি ইত্যাদি।' সর্বাণীর ছেলেরা

এখন হাইস্কুলে পড়ে। যখন তারা প্রাইমারিতে পড়ত তখন তারা নাকি রিক্সাকাকুর সঙ্গে স্কুলে যেত। সর্বাণীর মতে ছেলের যত্ন আত্তিটাই মূল কথা। টাকা পয়সার কথাটা ও ভাবে না। পরে অসীমার মুখে শুনলাম রিক্সাকাকু আসলে ওর বাচ্চাদের নিজেরই কাকু, বাসস্ট্যান্ডে ভাড়া ধরতে যাবার সময় ভাইপোদের নামিয়ে দিয়ে যায়। তা বেশ সত্য। মিথ্যা কল্পনার মিশেলে সর্বাণী বেশ কাজের, বিশ্বাসীও বটে।

সকালে আমার তাড়া থাকে বলে খুব একটা ডানা মেলার সুযোগ পায় না সে, স্কুল থেকে ফেরার পর বেশ একহাত গল্প করে নেয়। অবশ্য গল্প তো নয়, কল্পনার আকাশে অবাধে বিচরণ। মাঝে হাঁ, হু করতেও হয়, উপায় তো কিছু নেই। এরই মধ্যে একবার জানাল সর্বাণী কিছু টাকার দরকার ওর। একটা ডবল ডোর ফ্রিজ কিনবে। অনেকদিন আগেই কিনতে পারত, কেনেনি বড় দেখে কিনবে বলে। ফ্রিজে খাবার রেখে গরম করে খাওয়ার বাসনা তার একেবারেই নেই। কিন্তু রোজকার কাঁচা মাছটা রাখা যায়। বাজারে সপ্তাহে একদিনও গেলেও হয়। এই সব সুবিধে আর কি। আর কাজ থেকে ফিরে ফ্রিজের ঠাণ্ডা জলটা ওর ভালো লাগবে। ওর বরের নাকি এমন ব্যবসা রমরমিয়ে চলছে। কী ব্যবসা? সিনেমা হলের রাস্তাতে ফাস্টফুডের গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। শীতকালে ও ধুঁপি পিঠে বিক্রি করে। সেটা নাকি লোকে লাইন দিয়ে কেনে, এইসব।

ঠিক করলাম দেবো ওর প্রয়োজনীয় টাকা। ঠিকঠাক যদি থিতু হতে পারে হোক না। তাছাড়া কল্পনাবিলাসী হোক আর যাই হোক সংসারে ওর গুরুত্ব অস্বীকার করা যাবে না। সর্বদাই হাসিমুখ, আন্তরিকও বটে। এরই মধ্যে একদিন সকালে সর্বাণীর বড় ছেলের ফোন, জানাল মা আসতে পারবেনা বাবা অসুস্থ। পাঁচদিন কেটে গেল। উপায়ান্তর না দেখে ভাবলাম দেখে আসি ওদের। প্রয়োজন তা বটেই, তার সাথে বিবেকেরও তাড়নায়, বিকেলবেলা বড় রাস্তা পেরিয়ে ঢুকি ওদের কলোনিতে। রাস্তাটা আধা চেনা আধা অচেনা। জিজ্ঞেস করতে করতে এগোচ্ছি। হঠাৎ দেখা রীণার সাথে। রীণা আমাদেরই স্কুলের মিড ডে মিল রাঁধুনিদের পাণ্ডা। দুহাতে দুটো বালতি, একটাতে ভাত আর একটাতে কিছু আলু সোয়াবিনের তরকারি। আজ দুপুরের ছাত্রীদের খাবার। ওদের ভাগটা ওরা নিয়ে এসেছে বেঁচে যাওয়া খাবারের থেকে। রীণা একগাল হেসে বলে, দিদি আপনি? এদিকে? বললাম, সর্বাণীকে চেন? আমাদের বাড়িতে থাকে, ওর বরের খুব অসুখ, একটু দেখে যাই। হাতের ফলের ঝোলাটা দেখিয়ে বলি, অসুস্থ মানুষ দিয়ে আসি। রীনা বলল, অসুখ না ছাই, গিয়ে দেখুন কেমন অসুখ। তারপর যা ইতিহাস দিল তাতে বোঝা গেল, সর্বাণীর বরের রোলের দোকানের ধাপিতে রুটি বানাত যে মহিলাটি, তাকেই নাকি পাঁচদিন আগে বিয়ে করে এ বাড়িতেই তুলেছে সর্বাণীর বর। পাড়ার লোকের মধ্যস্থতায় মাঝামাঝি ইঁট গেঁথে ওই ঘরটিই দুভাগে ভাগ হয়েছে। এখন দুপাশে দুটি সংসার। ছেলেগুলো খেতে পাচ্ছে না তাই এই আলু সয়াবিন তরকারি আর ভাত কিছুটা দিয়ে এল বীনা।

পা দুটো অবশ হয়ে এল। বাঁদিক ঘুরে একদম শেষের বাড়িটায় আস্তে আস্তে পৌঁছালাম। একটি ঘরের দরজায় তালা। অপরটি ঘরের জ্বলছে টিমটিমিয়ে হালকা হলুদ রঙের আলো। দরজার দিকে পিঠ করে বসে আছে সর্বাণী, দুই হাঁটুর মাঝখানে মুখটা গোঁজা। শরীরটা অল্প অল্প কাঁপছে। সামনে ছেলেগুলো মুখ নিচু করে আগ্রহ সহকারে খাচ্ছে ভাত, আলু সয়াবিন। আমাকে খেয়াল করেনি কেউই। আর ধরা দিলাম না। আস্তে আস্তে সরে এলাম। ফলের ঝোলাটা হাতেই থেকে গেল। দিতে আর পারলাম না।

পরের দিন সকাল সকালই কলিং বেলে চাপ। বারবার নয় একবারই। ঝড়ের বেগে নয়, চোরের মতন গুটি গুটি পায়ে কোলাপসিবল পেরিয়ে ঢোকে সর্বাণী। এমনিতেই হালকা পাতলা শরীর ওর আরও ক্ষীণকায় হয়েছে। শ্বাশুড়ী জিজ্ঞেস করেন, অসুখটা কার হয়েছিল রে? তোর না জামাইয়ের? মৃদু হেসে সর্বাণী বলতে থাকে, 'আর বলোনা মামী, তোমাদের জামাইকে নিয়ে অথৈ জলে পড়েছিলাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শীতের রাতে রোল ভাজা কি চাট্টিখানি কথা? কী প্রচণ্ড জ্বর গো তোমাদের জামাইয়ের। যমে মানুষে টানাটানি। এক মুহূর্ত আমাকে চোখের আড়াল করে না। স্নান, খাওয়া কিছু ঠিকঠাক করতে পারিনি এই কয়দিনে।'

যাক গে, তোর ভাত আনছি, খেয়ে নে, বলে আমি দ্রুত ওর খাবার আনতে দৌড়াই রান্নাঘরে, আমার চোখে উপচে আসা জলটা বুঝি বা সর্বাণীকে গোপন করার জন্যই।

দ্বন্দ্ব

আল-আমিন

সকাল থেকে মেঘ মেঘ করেছে। বাতাসও স্তব্ধ। আকাশে একটাও পাখি উড়ছে না আজ। যেন আজ তাদের উড়তে মানা আছে। আজ কি তাদের ভোট!--- এ কথা মনে হতেই সৌগত মুচকি হেসে ওঠে। তারপরেই আবার কি মনে হতে মুখটা তার বিষন্নতায় ভরে যায়।

আজ কোন কাজ নেই, ভোটের জন্য কাজ বন্ধ। সকাল থেকে কী করব করব ভাবছিল সৌগত। রাজ্যের অনেক জায়গার মতই ভোট এখানেও হচ্ছে না। অতএব ভোট দিতে যাওয়ার কোন বালাই নেই। বউকে 'একটা গামছা দে' বলে পরনের জীর্ণ অথচ পরিষ্কার লুঙ্গির কোচ থেকে একটা দেশলাই বের করে কানে গোঁজা শেষ বিড়িটা নিয়ে ধরায়। মধু সৌগতকে জিজ্ঞেস করে, দুপুরে কী খাবেন?

যা ইচ্ছে, কর না। আর হ্যাঁ তোকে কাল যে টাকা দিয়েছি ওখান থেকে ২০ টা টাকা দে তো।

দাঁড়ান দিচ্ছি, বলে মধু ঘরে থেকে একটা গামছা আর কুড়ি টাকা বের করে এনে দিল। সৌগত টাকাটা নিয়ে লুঙ্গির কোঁচে গুঁজে ঘাড়ে গামছাটা রেখে বের হতে গিয়ে ঘুরে বলে, শোন, আমি দুপুরে নাও আসতে পারি, তুই খেয়ে নিস।

মধু মাথা নেড়ে সায় দিলে সৌগত নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে যায়।

সৌগত চল্লিশ ঊর্ধ্ব অশিক্ষিত সাধারণ একজন মানুষ। ভিটে ছাড়া তার আর কোন সম্বল নেই। কাশিমবাজারে মাল বওয়ার কাজ করে সংসারটাকে টিকিয়ে রেখেছে সে। সেখানে কোন দিন দু'শো তো কোন দিন চারশো উপার্জন হয়। আবার এমনও দিন যায় যে দিন কোন কাজ থাকে না, সে দিন কোন উপার্জন হয় না। অনেক সময় আগে থাকতেই জানতে পারে যে কবে কবে কাজ হবে না, সে দিন গুলো সৌগত বসে থাকে না। একশো সত্তর টাকা রোজে মুনিষ দেয়। মধু নিষেধ করে, মাসে একদিনও কি আরাম নেবেন না। শরীর এক্কেবারে ভেঙে গেছে... সেটা বুঝি দেখতে পান না!

মধুর কথায় সৌগত হাসে। বলে, বসে থাকলে হবে, আমাদের পেট আছে; মেয়েটা আছে তার বিয়া দিতে হবে না?

মধুর চোখে জল আসে, তা গোপন করে বলে, আগে তো মানুষের জানটা, নাকি! একটু হাসার চেষ্টা করে মধু। কান্না হাসির মিশেলে মধুর মুখটা আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। 'ওরে আমার জানের মধুমিতা' বলে মধুকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে সৌগত। 'ছাড়েন ছাড়েন' বলেও মধু নিজেকে সৌগতর কাছ থেকে দূরে সরায় না। বরং সৌগতর লোমশ বুকে নিজের মুখটা গুঁজে দিয়ে চোখ বুজে শান্তি পায়।

আবার কোন দিন হয়ত মধু বলে— আপনি কাশিমবাজারের কাজটা ছেড়ে দেন। এখুন আপনার বয়স হয়েছে, ওই সব বোঝা টোঝা বইতে হবে না; আপনি বরং মুনিষই দেন।

মধুর কথায় সৌগত হেঁয়ালি করে, বলে— কেন বয়স হয়েছে বলে বোঝা বইতে গিয়ে মরে যাব না কি! আর মরলে তো ভালই তুই আর একটা বিয়ে করবি।

অন্য দিনের মত মধু আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। তার সঙ্গে মজা করছে জেনেও সৌগতর কথায় তার ভেতরটা হু হু করে ওঠে। চোখ দিয়ে শ্রাবণধারা নামার আগেই ঘরে উঠে গিয়ে বালিশে মুখ লুকায় সে।

সৌগত বুঝতে পেরে উঠে গিয়ে পেরে তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে— মরণ কি অত সহজ রে! আমি তোর সঙ্গো একটু মজাও করব না! সৌগতর গলা ভারী হয়ে ওঠে। সে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। মধুও ধিরে ধিরে ধাতস্থ হয়। বালিশে মাথা দিয়ে ঘুরে শয়। কান্না ভেজা চোখে সৌগতর দিকে চেয়ে হাঁসার চেষ্টা করে। সৌগতও হাঁসার চেষ্টা করে,মধুর ভেজা চোখ দুটোই চুমু দিয়ে বলে— তুই জানিস না এসব কাজ আমি কেন করি!

মধু জানে লোকটা কি হাড় ভাঙা খাটনি করে। মাল বওয়ার কাজে মুনিষ খাটার চেয়ে যেমন অনেক বেশি উপার্জন তেমন পরিশ্রমটাও হয় খুব। সংসার চালানোর পরেও কিছু টাকা ব্যাঙ্কে জমাতে পারছে এই হাড় ভাঙা খাটনি করছে বলেই। ছেলেটা জন্য ভাবনা নেই, ও এখন ছোটো, বড় হলে যা হোক কিছু একটা করে খাবে; কিন্তু মেয়েটার জন্য টাকা তো জমাতেই হবে— বউকে বোঝায় সৌগত।

মধু তাই সৌগতকে কোন দিন জোর করে না। সৌগতর অনেক অভ্যাস খারাপ লাগা সত্ত্বেও কিছু বলে না মধু। প্রতি রাতে কুড়ি-ত্রিশ টাকা তাস খেলে উড়িয়ে আসলেও মধু রাগ করে না। সৌগতও যে মধুর খারাপ লাগা ভাল লাগা গুলো বুঝতে পারে না তা নয়, এসব ব্যাপার সৌগত এড়িয়ে যায় বা নিজের দোষ আগেই স্বীকার করে নেয়। যেদিন জিতে ফেরে সেদিন হাতে করে কয়েকটি বিস্কুট নিয়ে এসে হাসি মুখে বলে— তুই তো এসব খাবি না, সকালে ছেলে-মেয়েকেই দিস।

আসলে মধু কোনোদিন ও সব খায় না, বলে— আপনি উৎসাহ পাবেন, আমি খাব না।

আর যেদিন হেরে আসে মুখটা থাকে তার শুকনো। হেরে এসেছে বুঝতে পের মধু হেসে হেসে বলে— সব উড়িয়ে এলেন বুঝি?

সৌগত হারার জ্বালা ভোলার চেষ্টা করে বলে— কটা টাকা হেরেছি তো কি হয়েছে, হেরে এসেছি বলে রাগ করে এসব বলছেস নাকি! মধু কিছু বলে না, শুধু মুখ টিপে হাসে।

আজ সারাদিন কোন কাজ নেই, তাই হয় তো তাস খেলতে গেলো ভেবে মধু রান্নার জোগাড়ে মন দিল। পাঁচ মিশেলি শাক খেতে ভালবাসে সৌগত। সৌগত বাড়িতে থাকবে ভেবে এখান ওখান থেকে কয়েক রকমের শাক পাতা জোগাড় করেছে মধু। সে গুলোর পাশাপাশি ডালের বড়ার ঝোল আর ভাত রান্না করল সে। প্রতিদিন সকাল সকাল রান্না করে খাইয়ে দিয়ে টিফিনে করে খাবার দিয়ে দেয় সৌগতকে। নিজে ছেল-মেয়েকে স্কুলে পাঠিয়ে দিয়ে তবে খায়। আজ যেহেতু সবাই বাড়িতে থাকছে তাই সকালে সবাইকে রুটি সবজি করে দিয়েছিল। দুপুরে একবারেই রান্না করে নেয়, সন্ধ্যায় রান্না করার আজ ইচ্ছে নেই তার।

সৌগতর আসতে দেরি হবে, তাই ছেলে মেয়েকে নিয়ে খেয়ে নেয়। তাদের নিয়ে গল্প করতে বসে। কিন্তু সেই গল্প দীর্ঘস্থায়ী হয় না, ছেলে-মেয়ে দুটিতেই ঘুমিয়ে পড়ে। মধু ভাবে নিজেও একটু গড়িয়ে নেবে। বিকেলে সৌগত এলে ওকে খাইয়ে বাকি কাজ গুলো করবে।

যখন মধুর ঘুম ভাঙল তখন বিকেল পেরিয়ে গেছে। সকালের গোমড়া মুখো বিষণ্ণ আকাশ এখন ঝকঝকে হয়ে উঠেছে। মধুর ঘুমিয়ে যাওয়ার পর হালকা বৃষ্টি হয়েছে, তাতেই সমস্ত বিষণ্ণ গুমোট ভাবটা যেন ধুয়ে মুছে গেছে। দক্ষিণ দিক থেকে একটা ঝিরঝিরে হাওয়া এসে মধুর চুল গুলো দোলাচ্ছে। তবু মধু উসখুস করতে থাকে, ভাবে— লোকটা কেন কেন যে এখনও ফিরছে না!

'মা একটু খেলে আসছি' বলে ছেলেটি খেলতে চলে গেলো। মেয়েটি মায়ের পাশে এসে বসলো। বার কয়

'মা মা' বলে ডাকার পর মধু সাড়া দেয়, শুধু বলে— হু, বল।

তুমি কি ভাবছ ? আমার চুল বেঁধে দেবে না ?।

মেয়ের কথায় মুখটা লাল হয়ে ওঠে। স্বামী প্রেম নিজের ছেলে-মেয়ের কাছে বাঙালি মেয়েরা প্রকাশ করতে কোন কালেই চায় না। মধুও কোন দিন তার অন্যথা করে নি। তবু নিজের চিন্তার কথা প্রকাশ না করে মধু থাকতে পারল না, বলে— সকাল থেকে তোর বাবা কথায় যে গেল, না খেয়ে আছে সারা দিন...

বাবাকে ফোন কর নি?

করেছি, সুইচ অফ বলছে। যা ফিতে নিয়ে আয়, চুল বেঁধে দিই— বলে আবার রাস্তার দিকে দৃষ্টি দেয় মধু।

মেয়ের চুল বাঁধা হল, থালা বাসন মাজা হল, বাড়ি ঘর ঝাড় দিতে দিতে সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়ে গেল। মধুর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে, সৌগতর এত খেলার নেশার কী আছে! স্নানটা না হয় করেই বেরিয়েছে, কিন্তু না খেয়ে সারাদিন কী করে যে আছে! ছেলে মেয়েকে পড়তে বসিয়ে বাইরে বারান্দায় এসে বসে মধু।

রাত আটটার দিকে আসে সৌগত। চেহারায় একটা প্রসন্নতা। মধু দেখেও না দেখার ভাব নিয়ে বারান্দার দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকে। বারান্দায় চাঁদের আলো পড়ছিল, সেই আলোয় মুধুকে দেখতে পায় সৌগত। পাশে বসে সেও দেওয়ালে হেলান দেয়, বলে —কি গো আমার মধুমিতা, আজ সত্যি সত্যি রেগে আছো নাকি?

মুধু কোন কথা বলে না, যেমন ভাবে দেওয়ালে হেলান দিয়ে ছিল তেমনই থাকল, শুধু চোখটা বন্ধ করল।

কি কথা বলবে না নাকি? খিদে লেগেছে খেতে দেবে চল।

মধু তবু নড়ে না। নিশ্চল নিরুত্তর থেকে সৌগতকে যেন বোঝাতে চাইছে তার ব্যবহারে মধু খুবই ব্যথা পেয়েছে। সৌগত সাড়া না পেয়ে মধুর হাত খানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে— সত্যি খুব খিদে পেয়েছে, খেতে দিবে চলো।

মধু আর থাকতে পারে না। নিরবতা ভেঙে অনুযোগ সহকারে বলে— কেন, তাসের আড্ডায় খেতে দেয় নি বুঝি!

আজ ওখানে যায়নি গো' — সৌগত শান্ত ভাবে বলে।

মধু এবার উৎকন্ঠিত হয়ে ওঠে, বলে— তবে!

আমার মনে হয়েছে , ওখানে আর কখনও যাব না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে নদির ধারে ঐ যে যেখানে বুড়ো বট গাছ আছে না, সেখানে যাই। ওখানে অনেকক্ষণ বসি। ঠান্ডা বাতাসে খুব ভালো লাগছিল। গাছের ছায়ায় এবং ঠান্ডা বাতাসে গামছা বিছিয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়েও নিই। তারপর গামছা পরে নদীতে স্নান করে সারা মাঠ ঘুরেছি। মাঠে মাঠে ফসল দেখেছি, সন্ধ্যায় পাখিদের ঘরে ফেরা দেখেছি। একদিকে লাল সূর্য ডুবছে তো অন্যদিকে পূর্ণিমার চাঁদ উঠছে— তা দেখেছি।

মধু সৌগতর মাঝে পুরোনো সৌগতকে খুঁজে পাচ্ছে না কোথাও। কথার মধ্যে সাবলিলতা এবং সারা দিনের কর্মকান্ড কিছুই মিলছে না মধুর। 'সৌগতর শরীর খারাপ হয়নি তো' মনে হতেই বলে ওঠে--- ঠিক আছে, এখন ওঠেন, আগে খেয়ে নেন তারপর আপনার গল্প শোনাবেন।

দুটো ডিম ভেজে সৌগত ও ছেলে-মেয়েদের খেতে দেয় মধু। দিনের ভাত-সবজি আর এখনকার ভাজা ডিমের একটা সৌগতকে দেয়, অন্য ডিমটা ছেলে-মেয়েকে ভেঙে দেয় মধু। তা দেখে সৌগত বলে— তুমি ডিম খাবে না, থালা বাড় এক সঙ্গোই খাবে।

মধু বলে— আপনারা খেয়ে নিন , আমি পরে খাব।

'তাহলে আমিও এখন খাব না মধুমিতা, তোমার

সঙ্গেই খাব' বলে থালা সরিয়ে রাখে সৌগত । মধু থালাটা সৌগতর সামনে বাড়িয়ে দিয়ে নিজের জন্য থালা বাড়তে থাকে। সৌগত নিজের ডিমের অর্ধেক ভেঙে মধুর পাতে দেয়। মধু ডিম না খেতে চাইলে সৌগত হাঁসতে হাঁসতে বলে— ভালবেসে দিচ্ছি তাও নিতে চাইছ না। কী ভাবে বললে নেবে মধুমিতা।

এতক্ষণ ছেলে মেয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল, সৌগতর শেষোক্ত কথায় উচ্চ স্বরে কটমট হেসে উঠল। মধু কটমট করে তাকিয়ে বলে— এত হাসির কী হল!

মেয়ে মুখ নামিয়ে খেতে শুরু করে। ছেলে বলে— বাবা কী ভাবে কথা বলছে!

'খাওয়ার সময় খাওয়ার দিকে মন দাও'— মধু ছেলেকে ধমক দিয়ে সৌগতর দিকে ফিরে বলে, 'হয়েছে তো? হঠাত যে আপনার কি হল ? আবোল তাবোল কথা থামিয়ে খেয়ে নিয়ে আমাকে উদ্ধার করেন।'

খাওয়া শেষ করে সৌগত বাইরে বেরিয়ে এসে দাওয়ায় বসে। মধু থাল বাসনে জল দিয়ে, বিছানা তৈরি করে ছেলে মেয়েদের শুইয়ে বাইরে আসে। দেখে, সৌগত যেখানে বসে আছে সেখানে গোল হয়ে চাঁদের আলো পড়ছে। তার মনে হচ্ছে যেন সৌগতর শরীর থেকেই সে আলো বেরচ্ছে এবং তাতে সৌগতর বলিষ্ঠ দেহটা শান্ত ও সুন্দর হয়ে উঠেছে। নিশ্চল দৃষ্টি।

মধু একটু দূরে বসে সৌগতে দেখতে থাকে। মধুর আসা টেরও পায় নি সে। অপলক দৃষ্টি কথায় কি খুঁজছে। হঠাৎ পেঁচার আওয়াজে আর শুকন পাতার উপর দিয়ে ইঁদুর বা অন্য কিছু ছুটে পালানোর শব্দে নড়ে ওঠে সৌগত। মধুর উপস্থিতি বুঝতে পেরে তাকে কাছে ডাকে,— বলে তুমি এত দূরে কেন? এখানে এসো।

মধু কাছে এলে এক হাত দিয়ে তার মাথাটা নিজের বুকে চেপে ধরে। বলে— এতদিন আমার কর্ম ছাড়া সবই ভুল ছিল। এখন বাকি দিকেও নজর দিতে হবে। ছেলে মেয়েদের শিক্ষিত করতে হবে ভাল ভাবে। কর্মের সঙ্গে ওদের বোধটাও যেন গড়ে ওঠে। সবাই সজাগ হোক।

মধু বলে— আপনার ইচ্ছে পূর্ণ হোক, এটাই আমি চাইতে পারি।

—তুমি অনেক কিছুই পার মধুমিতা। তোমরাই পার। শুধু দূরত্বটা যেন না থাকে। তুমি আর আমাকে 'আপনি' বল না।

কাজী নামা

মহ. আসফাক আলম

আজ শুক্রবার। জায়েদের জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে যাচ্ছে। সকাল থেকে তারই প্রস্তুতি চলছে ঘরে বাইরে। তবে তাকে কিছু করতে হয় না আজ। সে এখন তিন দিনের রাজা বলে কথা। কিন্তু সব কিছুর প্রতি তার নজর রয়েছে বরাবর। কোন আত্মীয় এসেছে, কে এখনও এসে পৌঁছায়নি, কোথায় আছে ইত্যাদি খবর অনবরত নিচ্ছে সে এবং কী করণীয় তা বলে দিচ্ছে। এরই মধ্যে ডাক পড়ে জায়েদের। ছ'বার গায়ে হলুদ মাখানো হয়েছে তার। এখনও একবার বাকি। এবার মাখলেই গায়ে হলুদ পর্ব শেষ হবে।

বড় বৌদি বলে, জায়েদ, চলো তোমাকে হলুদ মাখাবো।

আর কত মাখাবে বৌদি?

এবারেই, আর নয়। ইহকালের মতো এই শেষ। নিচের বৈঠকখানায় চলে এসো।

আসছি। তুমি চলো, আমি এখুনি আসছি।

দেরি করো না। এমনিতেই অনেক বেলা হয়ে গেছে।

বৌদি চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে আবার নিচে থেকে ডাক আসে, জায়েদ নিচে নেমে এসো। আরেকবার গায়ে হলুদ দিতে হবে তো। তারপরে গোসল করাতে হবে। কত কাজ! হাতে একদম সময় নেই। তাড়াতাড়ি এসো।

এই এলাম।

এবার তাকে নিচে নামাতেই হয়।

জায়েদের বড় বৌদি হায়ার সেকেন্ডারি পাস। শুদ্ধ চলিত বাংলায় কথা বলে। ফলে বাড়ির ও বাইরের পুরুষ মানুষের ভিন্ন চোখে দেখে তাকে। আর মহিলারা তো দেখে অন্য অন্য চোখে।

বড় বৌদি, নিকটাত্মীয় সম্পর্কের বৌদি, দূর সম্পর্কের বৌদি, নানা সম্পর্কের বোন ও দিদিরা গায়ে হলুদ মাখতে থাকে। জায়েদের দাদি আসে হলুদ মাখানো দেখতে। দেখে বলে,

আরে ছুঁড়িরা, গীত গাহা নাটে, গায়ে হলুদ দিছিত গীত গ্যাহবি না!

এবার গায়ে হলুদের সাথে সাথে চলে সমবেত নারীকণ্ঠের গীত —

কাঁচা হলুদ ম্যাইখ্যা, কাঁচা হলুদ ম্যাইখ্যা
না যাইও সুন্দরীর মহলে হে,
বাপে না শুধাই ওরে ব্যাটা যায়েদ হে,
না যাইও মহলে হে,
কাহারি ঘরে যাইনাই কাহারি দুয়ার যাইনি,
জুত্তার মচকোন দ্যাখ্যা চুলের হিরো দ্যাখ্যা
নারী অ্যালো সোতে হে।
কারবা দুয়ার গেছিলি রে ভ্যাই?
অ্যাতো সুন্দর নারী কুনঠে পড়্যা পালি রে?
কাহারি দুয়ার যাইনি কাহারি ঘরে যাইনি,
ধুতির ফরকোন দ্যাখ্যা নারী অ্যালো সোতে।

সকাল ন'টার সময় বারাত রওয়ানা হয় দেবীপুরের দিকে। সালামপুর থেকে তিন কিলোমিটারের পথ। পাঁচ খানা টাটা সুমো সারি বেধে চলতে থাকে। প্রথমে থাকে বরের গাড়ি। তারপরেই থাকে মেয়ে বরয়াত্রী 'ডুলিবিবিদের' গাড়ি। তারপরে অন্যান্য বরসহযাত্রীদের গাড়ি। পিচের রাস্তা থেকে গাড়ি মাটির রাস্তায় নামে। আর কিছুটা গেলেই সালেহাদের বাড়ি। গাড়ি এগোতে থাকে। রাস্তা থেকে গাড়ি সালেহাদের গলিতে ঢুকতে যাবে তখনই ঘটে বিপত্তি। কিছু ছেলে লম্বা বাঁশ দিয়ে পথ আটকায়। চলে গাড়ি ঘেরা। ছেলেরা বায়না ধরে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে। নইলে গাড়ি ছাড়া হবে না। বরপক্ষ থেকে জসিমুদ্দিন সাহেব তাদের সাথে কথা বলে মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করে। অনেক কষাকষির পরে, অবশেষে এক হাজার টাকায় ফয়সালা হয়। গাড়ি এবার সালেহাদের গলিতে গিয়ে দাঁড়ায়। ডুলিবিবিদের গাড়ি সাইডে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের যে বসার জায়গা অন্দর মহলে। বরকে গাড়ি থেকে শ্যালক সম্পর্কীয়

দু'জন এবং দাদাশ্বশুর সম্পর্কীয় একজন নিতে আসে। দু'জনের একজন তাকে কোলে তুলে নিয়ে যেতে উদ্যত হলে জায়েদ নিষেধ করে, ওরা দরজায়, জানালায় ভিড় জমায়। তার সাথে সাথে চলতে থাকে গীত,

বরের মাথা সাদা সাদা রে লাল
টুপি মিল্যাতে পারোনি ওরে লাল?
বরের বহিন টুপি ভাতারি ওরে লাল
টুপি মিল্যাতে পারেনি ওরে লাল?

বরের চোখে সাদা সাদা রে লাল
সুরমা মিল্যাতে পারোনি ওরে লাল?
বরের ভানি সুরমা ভাতারি ওরে লাল
সুরমা মিল্যাতে পারোনি ওরে লাল?
বরের মুখ সাদা সাদা রে লাল
পান মিল্যাতে পারোনি ওরে লাল?
বরের দাদি পান ভাতারি ওরে লাল
পান মিল্যাতে পারোনি ওরে লাল?

হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেস হওয়ার জন্য বদনায় জল নেওয়া হয় প্রত্যেকের হাতে হাতে। এবার সবাই নির্দিষ্ট জায়গায় বসে। তারপরে ডাক আসে নাস্তা খাওয়ার। সামিয়ানা টাঙানো খাওয়া দাওয়ার জায়গায় সবাই চলে যায়। শুধু জায়েদ ও তার দুই সঙ্গী সেখানেই থাকে। তাদের সেখানেই ব্যবস্থা করা হয়। মেঝেতে পুয়ালের আসনে বসে শাল পাতায় ক্ষীর, রুটি ও মিষ্টি খাওয়ানো হয়। ধীরে ধীরে ঘড়ির কাটা বারোটার দিকে এগিয়ে যায়। বরযাত্রীরা এদিক ওদিক আশ-পাশ উঠে বসে দেখে নিয়ে ফিরে আসে তাদের বসার ঘরে। সালেহার বাবা, চাচারা, নিকটাত্মীয় বয়স্ক ব্যক্তিরা সেখানে আসে। গল্পগুজব চলতে থাকে। ইতিমধ্যে মুজিদ মৌলবি সাহেবও চলে আসেন। বিয়ের কাজীসাহেব। তিনিই বিয়ে পড়াবেন।

বিয়ে পড়ানোর আগেই কুড়ি কেজি বাতাসা, তিন থাপি পান ও সুপারি, মশলা জামাতের সর্দার সাহেবের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এবার মুজিত মৌলবি সাহেব বিয়ে পড়াতে শুরু করবেন। বাইরে চিৎকারের আওয়াজ কানে আসে। সালেহার বাবা, সর্দার সাহেব, মৌলবি সাহেব এবং উভয় পক্ষের কিছু লোক ব্যাপারটা দেখতে বিয়ের আসর থেকে বার হয়। দেখে জুম্মা মসজিদের ইমাম সাহেব এসেছেন। চিৎকারের আওয়াজ তার গলা থেকেই বের হচ্ছে। মুজিদ মৌলবিকে দেখে রাগে ফেটে পড়েন তিনি। বলেন,

আরে, মুজিদ আমি হচ্ছি ইমাম আর তুমি বিয়ে পড়াতে এসেছ? কার অর্ডারে তুমি এখানে এলে?

কারো অর্ডারে তো আসিনি ইমাম সাহেব। আমাকে মেয়ের আব্বা ডেকেছে, আমি এসেছি।

তুমি কি জান না, ইমাম সাহেব থাকলে অন্য কেউ বিয়ে পড়াতে পারে না!

মৌলবি সাহেবের মুখ ছোট হয়ে যায়। বলে,

আমার কী দোষ ইমাম সাহেব। আমাকে ডেকেছে আমি এসেছি।

তোমার দোষ নেই। তোমার আসার আগে আমার সাথে কথা বলে আসতে হতো। তুমি ভুল করেছ মুজিদ।

পাশ থেকে খাবির সাহেব সামনে এগিয়ে আসেন। বলেন,

কেন, ইমাম ছাড়া কি অন্য কেউ বিয়ে পড়াতে পারে না?

থতমত খেয়ে যান ইমাম সাহেব। এক পা সামনে সরাতে গিয়ে হোঁচট খান। সামলে নিয়ে বলেন, না, অন্য কেউও পড়াতে পারে। কিন্তু যখন আপনারা আমাকে ইমাম বানিয়েছেন তখন আমাকে না জানিয়ে তো এই রকম সামাজিক কাজ করা যায় না, সেটা অন্যায়।

সালেহার আব্বা মেয়ের বিয়েতে ঝামেলা চায় না। ইমাম সাহেবকে বলে,

দেখুন আমাদের অতো বেশি কিছু জানা ছিল না। যাক, যা হওয়ার হয়ে গেছে। আপনি আসুন,

একটু এদিকে আসুন।

বলে পাশের বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে কোল্ডড্রিংক্স, নাস্তাপানির ব্যবস্থা করেন। খুব খাতির যত্ন করেন। মৌলবি সাহেবও সেখানে বসে ছিলেন। সালেহার

আব্বা, তার তো আজ অবকাশ নেই। সে বাইরে গেলে, ইমাম সাহেব মৌলবি সাহেবকে বলেন,

বিয়ে দেওয়ানি কত টাকা ফয়সালা হয়েছে?

দেড় হাজার টাকা ইমাম সাহেব।

কেন, এতো কম কেন? পার্টি তো মালদার শুনেছি?

তাও এটাই দিতে চাইছিল না। অনেক দরকষাকষির করে রাজি করিয়েছি। আচ্ছা শোন, আমার জন্য পাঁচশ টাকা থাকবে তো?

হ্যাঁ, ঠিক আছে। আপনার ওটা থাকবেই।

ইমাম সাহেব বেরিয়ে গিয়ে চায়ের দোকানের সামনে চেয়ারে গিয়ে বসেন আর তার চোখ সসপেনের চায়ে আটকে থাকে। চা ফুটতে থাকে আর ফুটতে থাকে।

মৌলবি সাহেব প্রথমে কনের কাছে যায়। তার সাথে সাথে ছেলে পক্ষের কয়েকজনও যায়। মেয়ে কবুল করে কিনা তা শোনার জন্য। মৌলবি সাহেব বলেন,

যদিও মেয়ের আব্বার অনুমতি থাকলে মেয়েকে কবুল করাতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই তবুও সমাজে এটা চলে আসছে। তাই যাওয়া আরকি।

মেয়ের আব্বার অনুমতি নিয়ে তিনি এগিয়ে যান অন্দর মহলের দিকে। কনের সাজে সালেহাকে সজ্জিত করা হয়েছে। অনেক নারী তাকে ঘিরে রয়েছে। মৌলবি সাহব বড় খাতা, চিত্রগুপ্তের খাতার মতো, বের করে তিনটি জায়গা টিক দিয়ে সালেহাকে সই করতে বলে। সালেহা অনেক লিখেছে, অনেক পড়েছে। যত পড়েছে তার চেয়ে বেশি লিখেছে। পড়ে পড়ে আর লিখে লিখে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক আর মাস খানেক আগে বিএ পাসের ডিগ্রি পেয়েছে। কিন্তু আজ নিজের নাম লিখতে পারে না সে। হাতে যে তার প্রচণ্ড ব্যথা। অনর্গল চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। লিখবে কী করে, নিজে হাত তুলতেই তো পারে না। পাশে বসা এক মহিলা তার আঙ্গুল ধরে প্যাডে ডুবিয়ে টিপ দিয়ে দেয়। এবার মৌলবি সাহেব দাঁড়িয়ে গিয়ে কয়েকটি দুয়া পাঠ করেন। পাঠ শেষ হলে বলেন,

সালামপুর নিবাসী সাজ্জাদ হোসেনের পুত্র জায়েদ হোসেনকে নগদ দশ হাজার এগার টাকা দিনমোহরে আজকে থেকে আপনি কি নিজ স্বামী হিসেবে কবুল করলেন।

সালেহার ঠোঁট নড়ে ওঠে। কিন্তু এটাই তার শেষ অস্ত্র। এবার কিছু করতে না পারলে জীবন কবরে ঢুকে যাবে তার। তাকে এবার বলতেই হবে। অনেক কিছু বলল সে। আগেও অনেক বলেছে। কিচ্ছুটি হয়নি। অপমানে ঘৃণায় খায়নি কিছু। গলা শুকনো। ঠিক কী বলল বোঝা গেল না। বিয়েবাড়ির আওয়াজে তার আওয়াজ চিরকালের মতো চাপা পড়ে গেল। মহিলারা বলে, কবুল করেছে, কবুল করেছে, কবুল করেছে।

এইভাবে তিনবার একই গদ বলা হয়। এবার তিনি জায়েদের কাছে যান এবং তাকে সেই খাতায় সালেহার টিপের উপর তিন জায়গায় সই করতে বলেন। কষ্ট হলেও নিজের নাম লিখতে পারে সে। ঘস ঘস করে সই করে দেয়। এই হাত দিয়েই তো অনেক টাকা রোজগার করে। খারাপ মেশিন ভালো করে সে। খারাপ বাল্ব যেমন আলো জ্বালিয়ে ঠিক করে রোজগার করে তেমনি ভালো বাল্বকে খারাপ বলে আবার ঠিক করার কথা বলে রোজগার করে। সেই পথেই সালেহাকে দখল করছে সে। এবার দাঁড়িয়ে গিয়ে দুয়া পাঠ করতে থাকেন মৌলবি সাহেব-

''ইয়াআইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানুত্তাকুল্লা-হা হাক্কাতুকা-তিহী ওয়ালা-তামূতুন্না ইল্লা-ওয়া আনতুম মুছলিমূন।'' (হে ইমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক এবং অবশ্যই ইমান না এনে মৃত্যুবরণ করো না।)

''ইয়াআইইয়ুহান্না-ছুত্তাকূরাব্বাকুমুল্লাযীখালাকুম মিন নাফছিওঁ ওয়া-হিদাতিওঁ ওয়া খালাকা মিনহাঝাওজানা-ওয়াবাছছা মিনহুমা-রিজা-লান কাছীরাওঁ ওইয়ানিছাআওঁ ওয়াত্তাকুল্লাহাল্লাযী তাছাআলূনাবিহী ওয়াল আরহা-মা ইন্নালা-হা কা-না আলাইকুম রাকীবা।'' (হে মানবসমাজ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাঁর থেকে তাঁর সঙ্গিনিকে সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত নর

ও নারীকে। যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা করে থাক এবং আত্মীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে অবগত রয়েছেন।)

''ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানত্তাকুল্লা-হা ওয়ালা কূলূকাওলান ছাদীদা।'' (হে মুমিনগণ আল্লাহকে ভয় কর এবং সর্বদা সত্য কথা বলো।)

''ইউসলিহলাকুম আ'মা-লাকুম ওয়া ইয়াগফিরলাকুম যুনূবাকুম ওয়া মাইঁ ইউতি'ইল্লা-হা ওয়া রাছুলাহূফাকাদ ফা-ঝা ফাওঝান আজীমা।'' (তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করো।)

এবার বাংলায় শুরু করেন। বলেন,

দেবীপুর নিবাসী শাহ জামালের মেয়ে সালেহা খাতুনকে নগদ দশ হাজার এগার টাকা দিন-মোহর দিয়ে আপনি কি নিজ স্ত্রী হিসেবে কবুল করলেন?

হ্যাঁ, করলাম।

এইভাবে তিনবার কবুল করানো হয়।

সামাজিক ও অনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে সম্পূর্ণ হয়ে যায়। সবাই পরম করুণাময়ের কাছে নব-দম্পতির সুখ-শান্তি কামনায় হাত তোলে। মৌলবি সাহেব দুয়া পড়তে থাকেন আর অধিকাংশ ব্যক্তি আমিন আমিন বলে যায়। সর্দার এক মুঠো করে বাতাসা দিয়ে সবার মুখ মিষ্টি করায়। দুপুরের খাওয়া শেষ হতে চারটে বেজে যায়। গাড়ি ঘেরা, বরের হাত ধোয়ানো, কনে সাজানোর টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়। এবার জায়েদের সালেহাকে নিজের কব্জায় নিয়ে নেওয়ার পালা-বউ বিদায় পালা। এখন আর কাঁদেনা সালেহা। তার মা, দাদিরা তাকে গাড়িতে তুলে দিতে নিয়ে আসে, এখন তার আব্বার চোখে জল। কাঁদছে সে। সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। সালেহা তার সামনে দিয়ে চলে যায়, একবারও তাকায় না। আর শাহ জামাল মেয়ের যাত্রাপথের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকে, তাকিয়েই থাকে।

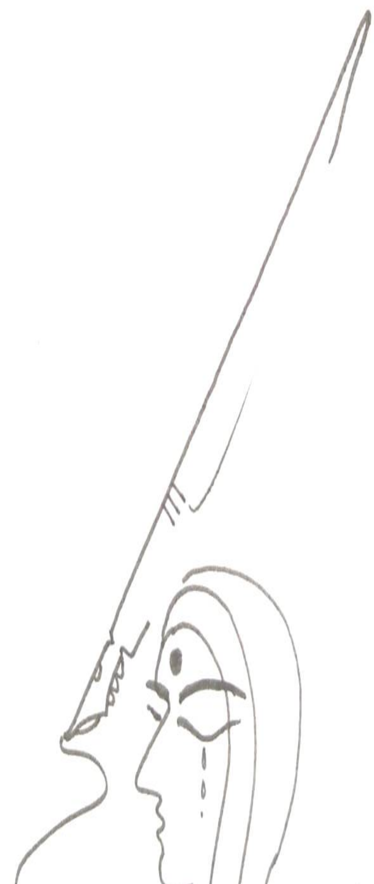

ছবি : হিমাদ্রী শেখর মজুমদার

কবি ও কবিতা

অশনিকা ঋদ্ধি

কব জমে পাথর হলো
গলছে কই?
শর গ্রাম অফিস পাহাড় সমতল মরুভূমি
শুয়ে
পড়েছে
ছুঁচো আরশোলা চামচিকে
বরাহের বাসর জমকালো আঁধারের সংসার
কোরাস ধরে নেত্য জুড়েছএ
ভূত-পেতনিরা, জম্পেশ আড্ডায় মশুল
ভূতের রাজা-রানি-বাদশা উজির নাজির
মন্ত্রী সান্ত্রী
লাম্পট্যের তানশানে ট্যারা চোখ জল মাপছে
দুর্যোধন

মাত্রা মাপা যায় না রাস্কেল উঞ্ছবৃত্তির
কৃমিকীট গুলোর...

শকুনি শুঁকছে
ভাগাড়
রক্ত
মরা পচা লাশ
আকাশএ চক্কর দিচ্ছে
চিল
পেঁচা তিনটে আলগোছো
দিনের আলোয় দেখা দিয়েই প্রাণ দিল...

রাত পাহারা কোথাও নেই কবি
কেঁদে চোখ মুখ ভাসলেই কি
তুমি রক্ষা পাবে ভেবেছো
ক্রন্দন করার শক্তি নেই,
কেঁদ না,
মশি হোক অশি
লেখ ইতিহাস-
আঁধার যাপনের নয়
গুড়ি মেরে সুড়ঙ্গা কেটে আত্মপ্রকাশের
আলোর আলেয়া নয়, বিদ্যুতের ঝলকানিও
চায় না..
চাই আলো
মুক্ত বায়ু
আর একটু ভাত-সেই রূপ কথার গল্প
লেখো কবি, শৈখিন রেখাবে তোমার দুংখ
গাথা রাখা হবে না কোনো দিন..
দাও উড়িয়ে ফুৎকারে মিছে পালিশ করা
শোকেশ সাজানো বিনুনী
নেমে আসে লাম্পট্যের কারবারিদের আর
নেশাড়ুদের নেশা আসরে..
দেখো নর্তকীদের নেত্ত
আসর জমানো তাসপাশায়
বন্দি দ্রোপদী
সাজানো আসরে ঘনঘন ধ্বনি উঠছে, শকুনি
সাজাচ্ছে ঘুটি
শিব ঢুলু ঢুলু চোখে নেশাতুর
ছাই ভস্ম মেখে সংজ্ঞা হীন
নিশ্ছিদ্র আঁধারে
অশরীরী তাণ্ডব

তুমি কি পারবেই
পাষাণের কান্না ভেঙে
মুক্ত দিতে রক্ত করবীর লাল আভা ফিরিয়ে
আনতে
রঞ্জন কি ফিরবে?
রাজা কী দুভের্দ্য পর্দা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে
আলোতে?
তুমি তো শিল্পী
কই তোমার মন্ত্র?

দাও মন্ত্র
ওড়াও ঝাণ্ডা
বাজাও ডংকা
অন্তত একটা কুরুক্ষেত্র..
একটা কুরুক্ষেত্র...

মোবাইল-৯৭৩৩৫৩৪৬২০

জ্যোতিষ এণ্টার প্রাইজ

প্রোঃ- প্রশান্ত মাজি এণ্ড সন্স

এখানে মার্বেল পাথর, গ্রানাইট, টাইলস, সমস্ত কোম্পানির এ্যাজবেষ্টার সুপ্রীম ও ফিনোলেক্স পাইপ, সেনেটারি গুডস্ এবং জলের লাইনের সমস্ত রকমের মাল পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।

নতুন রাস্তা (গঙ্গাধরপুর রোড), কাকদ্বীপ, দঃ ২৪ পরগণা

Issue date 25 April 2019.
Vol. 1, Issue 2 Voice mark

আজ বিশ্ব মূল্য বৈষম্যে ভারসাম্যহীন। সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব ও রাজনৈতিক দিশাহীনতায় শ্রমমানস অস্থির। তার লক্ষ্য নির্ণয়ে ব্যর্থ। এই সংকটাপন্ন পটভূমিতে শান্তি লক্ষ্যে-১। অস্তিত্ব: প্রবেশিকা (২১টি প্রবন্ধ) ১৫০. ২। মানুষ: দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং... (বর্তন ক্রম: এক) ২০০. ৩। মানুষ: দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং... (বর্তন ক্রম: দুই) ২০০. ৪। দেহমনের নিয়ন্ত্রণ এবং... ১২০ ।

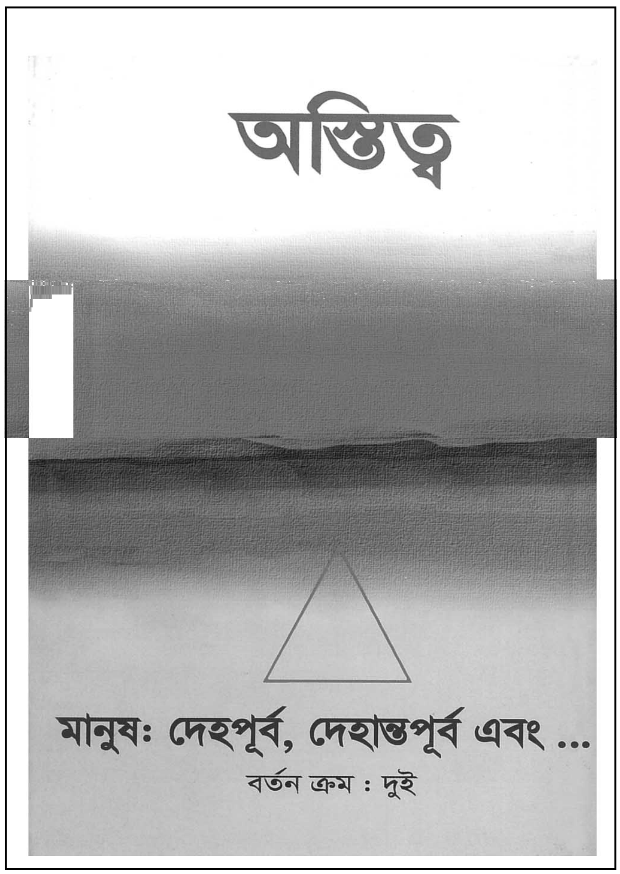

প্রকাশক: গাইডেন্স ফাউন্ডেশন
ফোন: ০৩৩-২২৮০-৬৭০৯/৫৫০৫
১৯৭ পার্কস্ট্রিট, কলকাতা-১৭, (পার্ক সার্কাস ময়দানের পাশে)

Published by Md. Firoz Hossain from Pirtala, Upar Fatepur, Lalgola, Murshidabad, Pin-742148 and printed by him at M/s. KIS Offset Press, Berhampore, Murshidabad, Pin-742101.